মানব সেবাই পরম ধর্ম

–খাজাবাবা কুতুববাগী

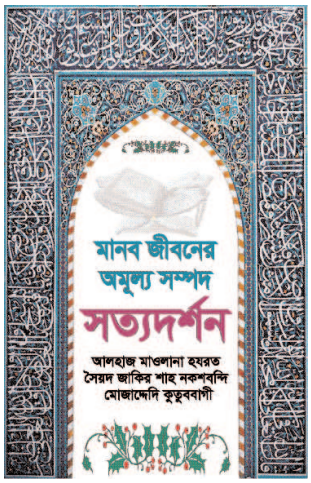
মানব জীবনের
অমূল্য সম্পদ
সত্যদর্শন
আলহাজ মাওলানা হযরত
সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি
মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

কুতুববাগ প্রকাশনী

প্রকাশকাল	ঃ	জানুয়ারি ২০১৬
প্রকাশক	ঃ	নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি কুতুববাগ প্রকাশনী ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা ১২১৫ ফোন ঃ +৮৮ ০২৫৮ ৮১৫৬৫২৮ www.kutubbaghdarbar.org.bd
গ্রন্থস্বত্ব	ঃ	পীরজাদী সৈয়দা মোসাম্মৎ জহুরা খাতুন তাসনিম
প্রচ্ছদ খেদমত	ঃ	সেহাঙ্গল বিপ্লব খাদেম, কুতুববাগ দরবার শরীফ
বর্ণবিন্যাস	ঃ	মো. তাজুল ইসলাম
মুদ্রণ	ঃ	কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস
প্রাপ্তিস্থান	ঃ	কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া লাইব্রেরি ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা
হাদিয়ামূল্য	ঃ	একশত টাকা

উৎসর্গ

হযরত খাজা গোলাম রাব্বানী (রঃ)

হযরত খাজা গোলাম রহমান (রঃ)

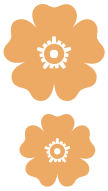

প্রকাশনা প্রসঙ্গে

একুশ শতকের আধ্যাত্মিক মহাসাধক শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজানের মহামূল্যবান নসিহত সংবলিত এই গ্রন্থ, যা বহু বছর ধরে কুতুববাগী কেবলাজান তাঁর লাখ লাখ ভক্ত-আশেক-জাকের-মুরিদের উদ্দেশে বিভিন্ন সময়ে নসিহতবাণী রূপে পেশ করে আসছেন। কেবলাজানের সমীপে ভক্ত-জাকের, মুরিদরা অনেকদিন ধরেই আর্জি জানিয়ে আসছিলেন যে, কোরআন-হাদিস-ইজমা ও কিয়াসের আলোকে প্রদত্ত এসব বাণী গ্রন্থ আকারে প্রকাশের। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসহ বিভিন্ন মাধ্যমে এসব গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ রচনা করে তা প্রকাশ করতে শুরু করেন তিনি। সেসব নিবন্ধেরই সংকলিত রূপ এই গ্রন্থ।

গ্রন্থিত এই লেখাগুলোর তাৎপর্য অপরিসীম। কেননা কোরআন-হাদিসের নির্যাস ছেঁকে এনেছেন খাজাবাবা কুতুববাগী তাঁর প্রতিটি নিবন্ধে। কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাতসহ ইসলামের শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত সংবলিত কর্মকাণ্ডের অনিবার্যতা যেমন এসব লেখায় সহি দলিলসহ উপস্থাপন করা হয়েছে, তেমনই ইসলামী জীবন বিধানের বহু অনুষঙ্গ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের শ্রম, নিষ্ঠা আর নিরলস সাধনা ও গবেষণার ফসল এ গ্রন্থে অত্যন্ত সহজ ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন। অনেকেই পীর-মাশায়েখদের নামে নানা বিতর্ক সৃষ্টির অপচেষ্টা করেন, এমন প্রশ্নও করেন যে, 'পীর' কোরআনে আছে কি'? না, কোরআনে এ শব্দ থাকার কথা নয়। পীর হল ফার্সী শব্দ। কোরআনের ভাষায় পীরকে বলা হয় 'মোর্শেদ'। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে 'অলি' এবং 'মোর্শেদ' কথাটি রয়েছে। সাধারণ মানুষের অজানা এমন অসংখ্য বিষয় খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান এই গ্রন্থের বিভিন্ন নিবন্ধে দলিলসহকারে তুলে ধরেছেন। এসব লেখার মধ্য দিয়ে পীর বা মোর্শেদের কাছে যাওয়া এবং বাইয়াতের কথা পবিত্র কোরআন ও হাদিসে কীভাবে বলা হয়েছে, তার উল্লেখ আছে। মারেফাত কী? পরিপূর্ণ ইসলমের সঙ্গে মারেফতের সম্পর্ক কী? পীরকে বাবা বলা হয় কেন? রাসুল (সঃ)-এর শানে মিলাদ-কিয়াম করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যেসব অনর্থক বিতর্ক সমাজে চলছে, পবিত্র কোরআন-হাদিসের নির্ভুল দলিল দিয়ে মোর্শেদকেবলা তারও সমাধান দিয়েছেন। আশা করি এ গ্রন্থ অসংখ্যা আশেকান-জাকেরান ভক্ত-মুরিদানদের জন্য এ এক অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার। দেশের সাধারণ মানুষ থেকে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যেও চিন্তার নতুন আলো ছড়াবে এ গ্রন্থ! ধর্ম ও প্রগতির মধ্যে কোনো বিরোধ যে নেই, সে সত্যও স্পষ্ট হবে। সূফীবাদের উদার মানবিক মূল্যবোধ বিস্তৃত হলে সমাজ থেকে সংকীর্ণতা ও সহিংসতা দূর হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শত চেষ্টা করেও কিছু শব্দের বানান এবং মুদ্রণ ত্রুটি এড়ানো গেল না। সচেতন পাঠক অনুগ্রহ করে লিখে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

—প্রকাশক

পৃষ্ঠা	সূচীপত্র
৯	শাজরায়ে মোবারক
১১	[খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান সংক্ষিপ্ত পরিচিতি]
১৫	সূরা ফাতেহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা
১৭	[খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের মহামূল্যবান নসিহত বাণী]
১৯	মহানবী (সঃ)-এর নূরেই জগত সৃষ্টি
২১	কোরআন হাদিস মতে অবশ্যই কামেল পীর-মুর্শিদ ধরতে হবে
২৭	তাসাউফ ও মারেফতের জ্ঞান ছাড়া অন্তরের রোগ দূর হয় না
২৯	ইসলাম ধর্মে যত প্রকার প্রার্থনা উপাসনা আছে তার মধ্যে নামাজই সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত
৩১	কোরআন-হাদিস মতে ছদকা ও মান্নতের বিধান
৩৬	শালিনতার ভিতরেই আধুনিকতা
৩৯	কামেল পীর-মুর্শিদকে বাবা বলার অকাট্য দলিল
৪১	আল্লাহতায়ালা আদম সৃষ্টির আগে ফেরেশতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন
৪৩	লাইলাতুল বরাতের গুরুত্ব (Importance of Lailatul Barat)
৪৫	মোরাকাবা কোরআন-হাদিসের দলিলে নির্ভুল প্রমাণিত
৪৭	পবিত্র মাহে রমজান রহমত-বরকত ও নাজাতের মাস
৪৮	সদকায়ে জারিয়া : মাতা-পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উপকারিতা
৪৯	গীবতকারীদের সম্পর্কে কোরআন-হাদিসে কঠোর হুঁশিয়ারী
৫১	আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাদের নিয়ে নিজেই নবীজির প্রতি দরূদ-সালামের মজলিশ করেছেন
৫৬	শরিয়তের দৃষ্টিতে ছবি রাখার বিধান
৫৭	আল্লাহতায়ালা কোরআন মজিদে তাঁর বন্ধু অলি-আউলিয়াদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষদেরকে সতর্ক করেন
৫৯	আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর দৃষ্টিতে এলমে তাসাউফ শিক্ষা ফরজ হওয়ার দলিল
৬০	শরিয়ত ও মারেফতের জ্ঞান ছাড়া কেউ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হতে পারবেন না
৬৩	নামাজে হুজুরীদিল না হলে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি না হলে এবাদত গ্রহণযোগ্য হয় না

পৃষ্ঠা	সূচীপত্র
৬৫	মহাপবিত্র ওরছ শরীফের তাৎপর্য
৬৭	শানে রেসালাত ও বেলায়েতের কিছু প্রমাণ
৬৯	কামেল মুর্শিদ বা পীরের কাছে যাওয়ার অকাট্য দলিল
৭১	তুমি যদি পূর্ণ মুমিন হতে চাও শরিয়তের ছোট-বড় হুকুম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মানিয়া চল
৭৩	পবিত্র কোরআন ও হাদিসভিত্তিক আদব রক্ষা করে চলা অপরিহার্য কর্তব্য
৭৪	পবিত্র কোরআনে আউলিয়া কেরামগণের মর্যাদা
৭৫	মহান আল্লাহর কাছে হযরত আদম (আঃ) অতি সম্মানিত
৭৬	নামাজে হুজুরীদিল ছাড়া কেহ আল্লাহর নৈকট্য বা দিদার লাভ করিতে পারিবে না
৭৯	যাকাত ও ফিতরা প্রসঙ্গে
৮১	রাসুল (সঃ) সকল জায়গায় (হাজির-নাজির) উপস্থিত এমনকি মানুষের মুমিন অন্তরেও অবস্থান করেন
৮৩	হযরত সোলায়মান (আঃ) ক্ষুদ্র প্রাণী পিপীলিকার কাছে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করলেন
৮৬	আল্লাহতায়ালার নিগূঢ় রহস্যের মহামূল্যবান বাণী
৮৭	ঈদুল আযহার কোরবানি পিতা করে পুত্র জবাই এমন ত্যাগের তুলনা নাই
৯১	পবিত্র কোরআনের আলোকে উছিলা অন্বেষণ করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য অপরিহার্য
৯৪	মহররম মাসের তাৎপর্য
৯৬	কামেলপীর চেনার উপায়
৯৯	সম্রাট আকবর ও বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মনগড়া দ্বীন-ই-এলাহী প্রসঙ্গে
১০৭	মুজাদ্দিদ কী এবং কেন
১০৯	৩৫ বছরের সাধনায় রিয়াজত ধ্যান-মোরাকাবা মোশাহাদায় পেলাম নামাজ ও জিকির সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত বা এবাদতে আকবর
১১১	আশেকান ও জাকেরানদের প্রতি আমার নসিহত অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে অজিফা আমল করিতে হইবে
১১৩	মহানবী (সঃ) বলেন, আমি আদম (আঃ) কে সৃষ্টির পাঁচশ চার কোটি বছর আগে আল্লাহতায়ালার কাছে নূরে মোহাম্মদী রূপে বিদ্যমান ছিলাম
১১৫	কোরআন মজিদে উছিলা বা মধ্যস্থতা ধরার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে
১১৮	আমার জাকের-মুরিদদের প্রতি নীতি-আদর্শ ও নসিহত বাণী

শাজরায়ে মোবারক

ঢাকার ফার্মগেট কুতুববাগ দরবার শরীফের পীর-মোর্শেদ শাহ্সূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদী কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদীয়া তরিকার খেলাফত হাসিলের শাজরায়ে মোবারক

১. ছরওয়ারে কায়েনাত মোফাখখারে মউজুতাদ হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)
২. আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)
৩. হযরত সালমান ফারছী (রাঃ)
৪. হযরত কাশেম ইবনে মোহাম্মদ বিন আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)
৫. হযরত জাফর সাদেক (রাঃ)
৬. হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৭. হযরত আবুল হোসেন খেরকানী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৮. হযরত আবু আলী ফারমুদী তুসী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৯. হযরত খাজা আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামদানী (রঃ)
১০. হযরত খাজায়ে খাজেগান আব্দুল খালেক আজদেদানী (রঃ)
১১. হযরত খাজা মাওলানা আরীফ রেওগিরী (রঃ)
১২. হযরত খাজা মাহামুদ আনজীর ফাগনবী (রঃ)
১৩. হযরত শাহ্ আজীজানে আলী আররামায়েতানী (কুঃ ছিঃ আঃ)
১৪. হযরত খাজা মাওলানা মোহাম্মদ বাবা ছাম্মাছী (কুঃ ছিঃ আঃ)
১৫. হযরত শাহ্ আমীর কালাল (রঃ)
১৬. শামছুল আরেফীন হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শব্দী (রঃ)
১৭. হযরত আলাউদ্দিন আত্তার (রঃ)
১৮. হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রঃ)
১৯. হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার (রঃ)
২০. হযরত শাহ্সূফী জাহেদ ওয়ালী (রঃ)
২১. হযরত শাহ্ দরবেশ মোহাম্মদ (রঃ)
২২. হযরত মাওলানা শাহ্সূফী খাজেগী এমকাঙ্গী (রঃ)
২৩. হযরত খাজা মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ (কুঃ ছিঃ আঃ)
২৪. ইমামে রাব্বানী, কাইউমে জামানী, গাউছে ছামাদানী, হযরত শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দী মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রঃ)

২৫. হযরত শেখ সৈয়দ আদম বিননূরী (কুঃ ছিঃ আঃ)
২৬. হযরত সৈয়দ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী (রঃ)
২৭. হযরত মাওলানা শেখ আব্দুর রহিম মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)
২৮. হযরত মাওলানা শাহ্ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)
২৯. হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভী (কুঃছিঃআঃ)
৩০. হযরত শাহ্ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (কুঃছিঃআঃ)
৩১. হযরত শাহ্সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ)
৩২. হযরত মাওলানা শাহ্সূফী ফতেহ আলী ওয়ায়েসী রাসূলে নোমা (রঃ)
৩৩. হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ ওযাজেদ আলী মেহেদীবাগী (রঃ)
৩৪. হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ খাজা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী নক্শন্দী মোজাদ্দেদী (কুঃছিঃআঃ)
৩৫. মোজাদ্দেদে জামান শাহান শাহে তরিকত হযরত মাওলানা আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরী নক্শন্দী মোজদ্দেদী (রঃ)
৩৬. শাহানশাহে তরিকত মোফাসসিরে কোরআন আলহাজ মাওলানা শাহ্সূফী কুতুবুদ্দীন আহম্মদ খান মাতুয়াইলী নক্শবন্দী মোজাদ্দেদী(কুঃছিঃআঃ)
৩৭. আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, মোজদ্দেদে জামান শাহ্সূফী আলহাজ মাওলানা খাজাবাবা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ কুতুববাগী নক্শবন্দী মোজাদ্দেদী (মাঃ জিঃ আঃ)

খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

খাজাবাবা কুতুববাগীর
১৩ বছরের ছবি

সূর্য রশ্মিতে রাতের ঘন আঁধার মুছে গিয়ে যেমন বিশ্ব চরাচর আলোকিত করে ফুটে ওঠে স্নিগ্ধ ভোর, ঠিক তেমনি সকল আলোর উৎস সৃষ্টিকুলের মূল নূরে মোহাম্মদী (সঃ) উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। তাঁর শুভাগমনে দূরীভূত হয় সৃষ্টি জগতের যত কুসংস্কার অনাচার, অন্যায়, অত্যাচার, অন্ধকার। পাপের সাগরে নিমজ্জিত মানুষকে হেদায়েতের পথে তুলে নেওয়ার জন্য কাল পরিক্রমায় আল্লাহতায়ালা যুগে যুগে নবী-অলি-আউলিয়াদের জগতে পাঠিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টির আদি থেকে শুরু করে ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। এ কথা মহান আল্লাহপাক পবিত্র কোরআন শরীফে ঘোষণা করেছেন।

একবিংশ শতাব্দীর এই ক্রান্তিলগ্নে পাপসংকুল পৃথিবীতে সৃষ্টির কুল কায়েনাতের মূল উৎস দো'জাহানের নবী মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সিরাজাম মুনিরার ধারক ও বাহক হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেন অসংখ্য ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া বা বেলায়েতে মাশায়েখগণ। তারই ধারাবাহিকতায় বিশ্বের পাপী-তাপী গুনাহগার মানুষের আত্মার উন্নতি ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পরশ পাথরের মতো মূল্যবান করে তোলার জন্য এবং নাজাত শিক্ষার মহান শিক্ষক হিসেবে শুভাগমন করেন, আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ, আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, যুগের শ্রেষ্ঠতম সাধক, হেদায়েতের হাদী, নকশবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকার খেলাফতপ্রাপ্ত পীর-মুর্শিদ বা পথপ্রদর্শক খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বন্দর থানার কলাগাছিয়া ইউনিয়নের শুভকরদী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ধার্মিক ও সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা জনাব মুন্সী খলিলুর রহমান এবং তাঁর মা জনাবা মোসাম্মৎ হালিমা খাতুন। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের পিতা-মাতা দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু, আল্লাহ প্রেমী এবং অতিশয় পরহেজগার মানুষ।

খাজাবাবা কুতুববাগী শিশু বয়সেই মাতৃহারা হন। যেদিন ঠিক ফজরের আযানের কিছুক্ষণ আগে কেবলাজানের মায়ের ইন্তেকাল হয়, সেদিন সকালে কলাগাছিয়া ইউনিয়নের ঘাড়মোড়া গ্রামের সোলেমান যিনি গরুর রাখালের কাজ করতো। তিনি কেবলাজানদের পালিত ১৮টা গরু ধলেশ্বরী নদীর ওপাড়ের চরে ঘাস খাওয়ার জন্যে খুটি গেড়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে আসে। বাদ আসর জানাজা নামাজের জন্য কেবলাজানের মায়ের লাশ যখন মাঠে আনা হয়, তখন দেখা গেল দড়ি ছিড়ে, নদী সাঁতরে সবগুলো গরু লাশের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। জানাজা শেষে দেখা গেল প্রতিটি গরুর চোখ থেকে পানি ঝরছে। কেবলাজানের মায়ের নামাজে জানাজা পড়ান জৈনপুরী মাওলানা জনাব আব্দুল খালেক সিদ্দিকী সাহেব, সেদিন তিনি ওই গ্রামে অবস্থান করছিলেন। তিনি এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে বললেন, এমন ঘটনা কোনোদিন দেখিনি। এই মরহুমা তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহর খুব প্রিয় এবং অতিশয় পরহেজগার ছিলেন।' খাজাবাবা কুতুববাগীর মায়ের ইন্তেকালের পর তাঁর এক নিকটতম চাচী-আম্মা অপরিসীম স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে কেবলাজানকে মাতৃ স্নেহে লালন-পালন করেন।

কেবলাজানের বয়স যখন ৮ অথবা ৯ বছর তখন চাঁদপুর জেলার দরবেশগঞ্জের সুযোগ্য আলেম মাওলানা গাজী মোঃ আবদুল আউয়াল সাহেবের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। মাওলানা সাহেব অতি আন্তরিকতার সাথে ভবিষ্যতের এই মহান তাপসকে আরবী ও বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতে থাকেন। খাজাবাবা কুতুববাগীর বয়স যখন ১২ কিংবা ১৩ বছর তখন একদিন শুভকরদী গ্রামের দক্ষিণে একদিকে ব্রক্ষ্মপুত্র অন্য দিকে শীতলক্ষ্যা এবং অপর দিকে মেঘনা এই ত্রিমোহনার চরে সমবয়সীদের সঙ্গে যান। তখন দুপুর ১২টা। ঐ সময় খাজাবাবা কুতুববাগী একা শীতলক্ষ্যা নদীর দিকে ধীর পায়ে হাঁটতে থাকেন, এমন সময় হঠাৎ দেখেন নদীর পাড়ে একজন বৃদ্ধ বসে আছেন। ঐ বৃদ্ধ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানকে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য ইশারা করলেন। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান বৃদ্ধের কাছে গেলে বৃদ্ধ বললেন, বাবা আমাকে এই নদীটি পার করে দাও। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান তাকিয়ে দেখলেন অদূরেই একটি নৌকা বাঁধা, বৃদ্ধকে সেই নৌকায় পার করে দেবার সময় নৌকা যখন নদীর মাঝ নদীতে, তখন বৃদ্ধ তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন, বাবা আমার নাম খিজির (আলাইহিস্ সাল্লাম)। তুমি ধ্যান করলেই আমাকে পাবে। এই বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন থেকেই খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান আধ্যাত্মিক সাধনার পথে চলে যান। এই সময়ে তিনি ৩ বছর কবর মোরাকাবায় (ধ্যান-মগ্ন) থাকেন এবং কবরে অবস্থান করেন। তারপর থেকে এই মহাসাধক আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের জন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অলি-আউলিয়া-পীর-ফকির-দরবেশের সান্নিধ্যে যেতে থাকেন। ১৩ থেকে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত বাংলা ভারতের অসংখ্য মাজার শরীফ জিয়ারত করেন এবং বহু অলি-আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে অনেক অলি-আল্লাহ-ই খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানকে তাঁদের এত্তেহাদী তাওয়াজ্জুহ শক্তিদান করেন। এই সময়ে একদিন খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান মহান আল্লাহ ও রাসুলের এশ্‌কে দেওয়ানা হয়ে মজ্জুব অবস্থায় সিলেটে হযরত শাহ সুন্দার (রঃ) এর মাজার শরীফ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তাঁর মাজার শরীফ টিলার উপরে অবস্থিত সেখানে যাওয়ার পথে একটি ঝর্ণা অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু তাতে প্রবল স্রোত থাকার কারণে ঝর্ণাটি পার হওয়া মুশকিল ছিল ওই সময়। তখন খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান কীকরে পার হবেন সেই কথা ভেবে একটু চিন্তায় পড়ে যান। আশেপাশে চোখের দৃষ্টি সীমার মধ্যে কোথাও কোন মানুষও দেখা যাচ্ছে না। এরই মধ্যে হঠাৎ এক বৃদ্ধ এসে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা আপনি কোথায় যাবেন? খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান বললেন, আমি হযরত শাহ্ সুন্দার (রঃ) এর মাজার শরীফ জিয়ারত করতে যাব। তখন ওই বৃদ্ধ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানকে কোলে তুলে নিলেন এবং চোখের পলকে ঝর্ণাটি পার করে দিয়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান একটু ভয় পেয়ে দৌড়ে টিলার উপরে মাজারে উঠ গেলেন এবং মাজার শরীফ জিয়ারত করে চলে আসেন।

এর কিছুদিন পর কামেল পীর পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে এক পর্যায়ে ফরিদপুরে চন্দ্রপুরী (রঃ) এর মাজার শরীফ জিয়ারতের জন্য সেখানে যান এবং মাজার শরীফ জিয়ারত করেন। জিয়ারতের সময় চন্দ্রপুরী (রঃ) এর রূহানী নির্দেশ পেয়ে খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের এক নিকট আত্মীয় জনাব শওকত কাজী ও বন্দর থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি, কলগাছিয়া ইউনিয়নের হাজরাদি চানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মাওলানা নূরুল ইসলাম মাস্টার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে, ঢাকার ডেমরা থানার অন্তর্গত মাতুয়াইল নিবাসী জগতবিখ্যাত আলেম, পীরে কামেল, পীরে বে-মেছাল, পীরে বে-নজির, মুর্শিদে মোকাম্মেল, হাদিয়ে জামান,

হেদায়েতের নূর, কুতুবে রাব্বানী, আলেমে হক্কানী, আলেমে রাব্বানী মোফাস্‌সিরে কোরআন, শাহসুফি আলহাজ্ব হযরত মাওলানা কুতুবুদ্দীন আহমদ খান মাতুয়াইলী (রঃ) নকশবন্দি মোজাদ্দেদির কাছে দরবারে মোজাদ্দেদিয়ায় উপস্থিত হন। কিছুক্ষণ পর শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুর দরবার শরীফে আসন গ্রহণ করেন এবং মুরিদানের সঙ্গে সাক্ষাত প্রদান করেন। শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুর খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের পরিচয় জানার পর তাঁর সঙ্গে আসা জনাব শওকত কাজী ও আলহাজ্ব মাওলানা নূরুল ইসলাম মাস্টার সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, এই ছেলের মধ্যে বেলায়েতের ছাপ আছে! ছেলেটি মাদারজাদ অলি।'তখন সকাল দশটা। এই সময় থেকে রাত দশটা পর্যন্ত শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুর খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের সঙ্গে শরিয়ত ও মারেফতের বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিগুঢ়ভাবে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। এর ফলে খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের মনে এমন এক ভাবের উদয় হল যে, ইনিই বুঝি আমার মনের মানুষ, যাঁর তালাশে এতটা বছর তৃষিত হৃদয় নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরেছি।' কিন্তু মনের কথা আর মনে থাকলো না, কী এক অপার লীলায়! মন থেকে কেবলাজানের পবিত্র জবানে তা বলেও ফেললেন, বাবা আপনিই আমার একমাত্র প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ।' এরপর খাজাবাবা কুতুবাগী কেবলাজান শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুরের কাছে ইলমে মারেফতের তিনটি তত্ত্ব জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, বাবা আপনি এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর জেনে যাবেন। জেনে যাবার পর এসে বাইয়াত গ্রহণ করবেন। তখন শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুরের অনুমতি পেয়ে সঙ্গীদের নিয়ে খাজাবাবা কুতুবাবাগী কেবলাজান বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁর মনের ভিতরে খুঁজতে থাকেন ইলমে মারেফাতের তিনটি প্রশ্নের উত্তর এবং খুঁজতে খুঁজতে কিছু দিনের মধ্যে তা পেয়ে গেলেন! এরপর অত্যন্ত খুশী মনে খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান এবং তাঁর বাল্য জীবনের সঙ্গি আলহাজ্ব নূরুল ইসলাম মাস্টার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে মাতুয়াইল দরবারে মোজাদ্দেদিয়ায় উপস্থিত হন। মাস্টার সাহেব ছিলেন খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের দীর্ঘদিনের সাধনার জগতে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে একনিষ্ঠ সঙ্গী। তাঁকে সঙ্গে নিয়েই শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুরের কাছে তরিকা গ্রহণ করেন খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান। শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুরও খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানকে সাদরে গ্রহণ করেন। তরিকা গ্রহণ করার পর খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান জান- মাল দিয়ে আপন মুর্শিদের খেদমতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুরও কেবলাজানকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ইলমে শরিয়ত, তরিকত, হাক্বিকত ও মারেফতের শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুর কেবলাজানকে অত্যন্ত স্নেহ এবং মায়া করতেন। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানও নিজ মুর্শিদের কদমে খেদমত করে অত্যধিক আনন্দ লাভ করতেন। শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুরের খেদমতে থাকার সময় খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানকে অনেক দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ-তীতিক্ষাসহ কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তরিকা গ্রহণ করার পাঁচ বছর পর শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুর একদিন খাজাবাবা কুতুববাগীকে তাঁর পৈত্রিক বাড়ি শুভকরদী গ্রামে খানকা শরীফ প্রতিষ্ঠার হুকুম করেন। খাজাবাবা কুতুববাগী আপন পীরের নির্দেশ মত খানকা নির্মাণ করলেন এবং প্রাণপ্রিয় মুর্শিদকে দাওয়াত করলেন। শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুর খাজাবাবা কুতুববাগীর এই দাওয়াত অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করলেন এবং খানকা শরীফ উদ্বোধন করে তিনি তরিকায়ে নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া প্রচার করতে আদেশ দিলেন। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান তখন থেকে নিজ মুর্শিদের নামে মানুষদেরকে (কলব বাতানো) কলবের শিক্ষা দেওয়া শুরু করেন। একদিন শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুর খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানকে আদেশ করলেন, বাবা এখন তোমাকে সাদী

মোবারক করতে হবে। শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুর চন্দ্রপাড়া পাক দরবার শরীফের খলিফা হাকিম মাওলানা আব্দুল গফুর সাহেবকে নির্দেশ দিলেন যে, আপনি ১৩ দিনের মধ্যে জাকির শাহ্কে বিবাহ করানোর ব্যবস্থা করেন। এই নির্দেশ পেয়ে হাকিম মাওলানা আব্দুল গফুর সাহেব খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানেরই ভক্ত কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মিঠামইন থানার ঘাঘরা গ্রামের জনাব মোঃ শাহেদ আলী সাহেবের প্রথম কন্যার সঙ্গে শুভবিবাহের প্রস্তাব করেন। জনাব মোঃ শাহেদ আলী সাহেব এই প্রস্তাব পেয়ে অত্যন্ত খুশি মনে তা গ্রহণ করেন। শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুরের অনুমতিক্রমে পরের শুক্রবার বিবাহের দিন ধার্য হয়। মাতুয়াইল পাক দরবার শরীফের জামে মসজিদে বাদজুমা অসংখ্য আশেকান ও জাকেরানের উপস্থিতিতে মহাধূমধাম করে মহান আল্লাহর এই অলি-বন্ধু যুগশ্রেষ্ঠ হাদী খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের শুভ বিবাহের কাজ সুসম্পন্ন করেন এবং তাঁকে খেলাফতের গুরুদায়িত্বভার অর্পণ করেন।

বিবাহের কিছুদিন পর শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুর, খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানকে কলাগাছিয়া ছেড়ে বন্দর এলাকায় দরবার শরীফ স্থাপনের হুকুম করেন। মুর্শিদের আদেশ মত বন্দর থানার স্বল্পেরচক এলাকায় নিজ মুর্শিদের নামানুসারে দরবারের নামকরণ করেন, কুতুববাগ দরবার শরীফ। আর এখান থেকেই খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান তাঁর নিজের নামে তরিকা প্রচার শুরু করেন। দিনে দিনে তাঁর সুনাম এলাকার গন্ডি পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। কেবলাজানের দরবার হয়ে উঠে ভক্ত আশেক-জাকেরদের বালাখানা! ইতোমধ্যে খাজাবাবা কতুববাগী কেবলাজানের ঘর আলোকিত করে আসেন প্রথম পুত্র সন্তান। তাঁর নাম রাখা হয় খাজা গোলাম রব্বানী। কিন্তু আল্লাহতায়ালা বেশি দিন তাঁকে দুনিয়াতে রাখলেন না। শৈশবেই তিনি ইন্তেকাল করেন। নারায়ণগঞ্জ বন্দর দরবার শরীফে তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত। সেখানে খাজাবাবা কতুববাগীর জন্মতাদা পিতা মুন্সি খলিলুর রহমানের মাজারও রয়েছে। প্রথম পুত্রের ইন্তেকালের পর, ঘর আলোকিত করে আসেন এক কন্যা সন্তান তাঁর নাম রাখা হয় সৈয়দা মোসাম্মৎ জহুরা খাতুন তাসনিম। এরপর দ্বিতীয় পুত্র খাজা গোলাম রহমান তিনিও দুনিয়াতে বেশি দিন বেঁচে রইলেন না, আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে শিশু বয়সেই চলে গেলেন পরপারে। বাবাজানের প্রথম খানকা শরীফ কলাগাছিয়াতে তাঁর মাজার অবস্থিত। এভাবেই শুরু হয় খাজাবাবা কুতুববাগী (মাঃ জিঃ আঃ) কেবলাজানের নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার মহামূল্যবান আদর্শ ও সত্যদর্শনের বাণী প্রচারের বিরামহীন কর্মধারা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সুমনোনীত এই তাপসের আধ্যাত্মিক গুণের আলোয় মানুষের অন্ধকার কলবকে আলোকিত করে যেমন তা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্ম-বর্ণ-জাতি- গোত্র নির্বিশেষ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের নূরানী স্পর্শ, আর তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য পাওয়ার বুকভরা আশা নিয়ে ছুটে আসছেন কুতুববাগ দরবার শরীফে। কেবলাজানের স্বভাব সূলভতার মাধুর্য্য দিয়ে সবাইকে তিনি পরম মমতায় আপন করে নিচ্ছেন প্রত্যহ। এ এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা! শুধু ব্যবহার দিয়েই যে মানুষের মন জয় করা সম্ভব। এখনো খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানকে যারা দেখেননি বা তাঁর সান্নিধ্যে আসেন নি তাদের কাছে সত্যি আশ্চর্যই মনে হবে। আর যারা কেবলাজানের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে রাসুল (সঃ) এর সত্য তরিকায় শামিল হচ্ছেন, তাদের আত্মশুদ্ধি, দিল জিন্দা ও নামাজে হুজুরি লাভ করে, নিজ নিজ কলবে আল্লাহপাকের ইস্মে জাতের জিকির জারী করছেন। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে ঈমানের সঙ্গে কবরে যাওয়ার মহা নিয়ামত লাভের জন্যে পবিত্র কোরআনের আলোকে সঠিক পথ দেখাচ্ছেন খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান ।

সূরা ফাতেহার অনুবাদ ও ব্যাখা

বিসমিল্লা-হ্ির রাহ্মা-নির্ রাহীম
অর্থ: পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়ালু আল্লাহর নামে।
সূরা ফাতেহা
মক্কায় অবর্তীণ, রুকু-১, আয়াত-৭
১) আলহ্ামদু লিল্লা-হি রাব্বিল্ আলামিন।
অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টি জগৎ-এর পালনকর্তা।
২) আর্ রাহ্মানির্ রাহীম।
অর্থ: যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু।
৩) মা লিকি ইয়াও মিদ্দীন
অর্থ: যিনি কর্মফল দিবসের মালিক।
৪) ইয়্যা কানা'বুদু অইয়্যা কানাস্তাঈন।
অর্থ: আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।
৫) ইহ্দিনাছ ছিরাত্বোয়াল মুস্তাক্বীম
অর্থ: আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।
৬) ছিরাত্বোয়াল্লাযীনা আন্-আম্তা আলাইহিম।
অর্থ: সেই সকল মানুষের পথে, যাঁদেরকে আপনি নিয়ামত এবং বাতেনী চক্ষু দান করেছেন।
৭) গাইরিল্ মাগ্দ্বুবি আলাইহিম ওলাদ্ব-দ্বোয়াল্লীন্
অর্থ: সেই সমস্ত মানুষের পথে নয়, যে সমস্ত মানুষ আপনার গজবে নিপতিত এবং পথভ্রষ্ঠ হয়েছে।
ইসলাম শুধু শরীয়তে নয়, তরিকতে নয়, হাকিকতে নয়, মারেফতে নয়। শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফতের সমন্বয়ই পরিপূর্ণ ইসলাম।
রাসুল (সঃ) বলেন– আস শরিয়তু আকওয়ালী, আত তরিকতু আফওয়ালী, আল হাকীকতু আহওয়ালী, আল মারেফাতু আসরারী। অর্থ: শরিয়ত আমার বাক্য, তরিকত আমার কাজ, হাকিকত আমার অবস্থান, ইলমে মারেফত আমার নিগুঢ় ভেদ ও রহস্য। ইমাম মালেক (রহ:) বলেন, যে শুধু শরিয়ত করে সে ফাছেক, আর যে শুধু মারেফত করে সে হলো জিন্দিক বা কাফের। আর তোমরা যদি মুমেন হতে চাও বা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাও তাহলে উভয় ইলেম শরিয়ত ও মারেফাত আমল কর।
আমাদের হানাফি মাজহাবের ইমাম, ইমাম আবু হানিফা (রহ:) ফিকাহ কিতাবের মধ্যে বলেন, লাউ লা সিনতানে হালাকা নুমান।' অর্থ: আমি নুমান যদি দুই বছর আমার পীর বাকের (রহ:)এর খেদমত বা গোলামী না করতাম তবে ধ্বংস হয়ে যেতাম। তিনি আরো বলেন, ইলমে শরিয়ত বাইরের দিককে পরিশুদ্ধ করে। আর ইলমে মারেফত ভিতরের দিককে পূত:পবিত্র করে।
মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী (রহ.) বলেন– 'খোদ বা খোদ কামেল না শোধ মাওলানা রুম, তা গোলামে শামচে তাবরিজি না শোধ।' অর্থ: আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মাওলানা হতে পারি নাই, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার পীরে মোর্শেদ মাওলানা শামছুদ তাবরীজির দাসত্ব বা গোলামী বা আনুগত্য না করেছি। তিনি আরো বলেন, দর হাকিকত গাশ্তে দুরাস খোদা, গরশুভি দুরআজ ছোহবতে আউলিয়া।' অর্থ: সত্যিকারে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে দূরে আছে, যে ব্যক্তি অলি-আল্লাহগণের নিকট থেকে দূরে থাকে। তিনি আরো বলেন, গারতুখাহী হাম নাসিনী বা খোদা, গোনশিনি দর হুজুরে আউলিয়া।'

অর্থ: তোমরা যদি আল্লাহর দরবারে বসতে চাও, তবে আউলিয়াদের সামনে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে বসে যাও। যাঁহার খেদমত করলে দিল নূরানী হয়, মুর্দা দিলজিন্দা হয় ঐ গুণের লোক যদি মিসকিনও হয়, তবুও জানেমালে খেদমত করে তার কদমে জীবন নেছার বা উৎসর্গ করে দাও। আরো উল্লেখ রয়েছে, গারতু চাহে আচলে হক আয় বেখবর, কামেলুকা খাকে পা ছের বছর।' অর্থ: হে বেখবর! তুমি যদি আল্লাহর সাথে মিশতে চাও, তবে একজন কামেল পীরের পদধুলী হয়ে যাও। গরিবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ:) বলেন, আমি ধ্যান বা মোরাকাবা করলে একটি নূর দেখতে পাই, সেই নূরের আলোতে তামাম কুলকায়েনাত আলোকিত হয়ে যায়। এর জবাবে বড়পীর (রহ:) বলেন, হে মঈনুদ্দিন চিশতী উনি হলেন মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহ:) তার নূরের কাছে আমাদের সকল তরিকা জিন্দা থাকবে।

সুরা ফাতাহ, ১০ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেন, ইন্নাল্লাযীনা ইয়ুবায়িউনাকা ইন্নামা ইউবায়িউনাল্লাহ্া ইয়াদুল্লাহি ফাওক্বা আইদীহিম।' অর্থ: হে রাসুল (সঃ) যাহারা আপনার হাত মোবারকে বাইয়্যাত গ্রহণ করল, তারা যেন আমি আল্লাহর হাতে বাইয়্যাত গ্রহণ করল। আমার হাত তাদের হাতের উপর রহিয়াছে।

আমি খাকছার জাকির বলতেছি যে, যাহারা কোন কামেল মোর্শেদ বা নায়েবে রাসুলের হাতে হাত দিল তারা যেন রাসুল (সঃ)-এর হাতে হাত দিল, আর যাহারা রাসুল (সঃ)-এর হাতে হাত দিয়েছেন তারা যেন আল্লাহর হাতে হাত দিয়েছেন।

সূরা কাহাফ এর ১৭ নং আয়তে আল্লাহপাক আরো বলেন, অমাই ইয়ুঁদ্বলিল ফালান্ তাজ্বিদা লাহু অলিয়্যাম মুর্শিদা।' অর্থ: যাহারা পথভ্রষ্ট হতভাগা, গোমড়া, পথহারা তাদের ভাগ্যে কখনো পথপ্রদর্শনকারী ও কামেল মুর্শিদ মিলবে না। যে সমস্ত মানুষের ভাগ্য ভালো, তারা কোন না কোনভাবে শেষ জামানায় কামেল মোর্শেদ পাবে।

সূরা তওবাহ্, ১১৯ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেন, ইয়া-আইয়্যু হাল্লাযীনা আ-মানুত তাকুল্লাহা অকুনু মা-আছ ছোয়াদিক্বীন।' অর্থ: হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় কর, ছাদিকিন ও কামেল মোর্শেদের সঙ্গী হয়ে যাও।

সূরা লোকমন, ১৫ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেন, ওয়াত্তাবি সাবীলা মান্ আনাবা ইলাইয়্যা।' অর্থ: আমার দিকে যে ব্যক্তি রুজু হয়েছে, আমাকে চিনেছে, পেয়েছে ও আমাকে চেনার কায়দা জানে তাহাকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ (ফলো) কর।

সূরা শুরা, ২৩ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেন, কূল্লা আস্ আলুকুম আলাইহি আজ্বরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল ক্বোরবা।' অর্থ: হে আমার রাসুল (সঃ) আপনি মানব জাতিকে বলে দিন, তোমাদের কাছে রেসালাত পৌঁছে দেওয়ার বিনিময়ে, তোমাদের কাছে কিছু চাই না, শুধু তোমরা আমার আহলে বাইয়্যাত, পাক পাঞ্জাতন আমার সাহাবা ও আমার আসহাবে সূফ্ফাদের ভালোবাস। নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আহলে বাইয়্যাতের উদাহরণ হযরত নূহ (আ:)-এর কিস্তির মতো, যাহারা এই কিস্তিতে উঠেছিল তাহারা নাজাত পেয়েছিল। (তিরমিযি ও মুসলিম শরীফ)

সূরা নিসা, ১৫০ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেন, ওয়া ইয়ুরীদুনা আই ইয়ু ফাররিকু বাই নাল্লাহি ওয়া রুসুলিহি।' অর্থ: তোমরা আল্লাহ ও রাসুল এর মধ্যে পৃথক করিও না।

সূরা নিসা , ৮০ নং আয়াতে আল্লাহপাক আরো বলেন, মাই ইয়ুত্বিইর রাসুলা ফাক্বাদ আত্বোয়া আল্লাহ।' অর্থ: যে রাসুল (সঃ)এর আনুগত্য করল, দাসত্ব করল, পায়রুবী করল, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল। দাসত্ব ও পায়রুবী করল।

টীকা ঃ যে কামেল মোর্শেদের গোলামী বা পায়রুবী করল, সে রাসুল (সঃ)-এর গোলামী বা পায়রুবী করল। আর যে রাসুল (সঃ)-এর গোলামী করল, সে তো আল্লাহরই গোলামী করল।

খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের মহামূল্যবান নসিহত বাণী

তোমরা প্রত্যেকেই নিজের নফসে আম্মারার সঙ্গে যুদ্ধ করো এবং তাকে বশ মানাতে চেষ্টা করো, তবেই আল্লাহতায়ালা তোমাদের সফল করবেন।
পীরের খাসলতে খাসলত ধরো, তবেই ত্রাণ ও শান্তি।
প্রত্যেক নিঃশ্বাসেই খেয়াল কলবের ভিতর ডুবিয়ে রাখো, নইলে (পথভ্রষ্ট) হালাক হবার ভয় আছে। জীবনভর ইবাদত করে শেষ নিঃশ্বাসের সময় আল্লাহকে ভুলে মরলে সমস্ত ইবাদত বিনষ্ট হয়ে যাবে, বেঈমান হয়ে মরবে। তাই, আল্লাহর প্রিয় অলি-বান্দাগণ ঈমানের সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার জন্য, মহান আল্লাহতায়ালার হুজুরে জীবনভর কাঁদছেন। তোমরা ঈমানের সঙ্গে মরার জন্য কয়দিন কেঁদেছো? মাতালের মত বেহুঁশ হয়ো না, হুঁশিয়ার হও! অমূল্য জীবন স্বপ্নের মত চলে যাচ্ছে, ফিরে আর পাবে না।
যদি পরিপূর্ণ মুসলমান হতে চাও, তাহলে শরিয়তের ছোট বড় যাবতীয় হুকুম-আদেশ মেনে চল। তবেই মারেফতের জ্ঞান লাভ করা, তোমাদের জন্য সহজ হবে।
যারা আমার শিষ্যত্ব বা বাইয়াত গ্রহণ করবে, তারা চুরি করবে না, মিথ্যা বলবে না, অন্যের গীবত করবে না, জ্বেনা-ব্যাভিচার করবে না, অপরের হক নষ্ট করবে না, এসব থেকে বিরত থাকলেই কামেলে ইনসান হতে পারবে।
পরম আত্মার সঙ্গে নিজের আত্মার যোগসূত্র করা প্রতিটি মানুষের অবশ্যই কর্তব্য এবং সে বিদ্যাই সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যা, যার মাধ্যমে মহান আল্লাহতায়ালার দর্শন লাভ করা যায়। কামেল পীরের তাওয়াজ্জুহ বলে মুরিদের মুর্দা দিলজিন্দা হয়ে, প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করতে পারে। মুর্দা দিলজিন্দা হলে ওই দিলে আল্লাহ ও রাসুলের (সঃ) খাস মহব্বতের ফয়েজ ওয়ারেদ (বর্ষিত) হতে থাকে। কেবল তখনই মানুষ হুজুরি দিলে নামাজ আদায় করতে সক্ষম হয়।
শুধু মুখে আল্লাহর নাম আর অন্তরে দুনিয়ার চিন্তা, এমন নামাজে কোনো ফল নেই। তাই ৯. রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'নামাজই নয় হুজুরি দিল ব্যতীত' সুতরাং নামাজ পড়বার সময় চিন্তা-খেয়ালকে সব দিক থেকে ফিরিয়ে নিজের ক্বলবের ভিতর ডুবিয়ে রাখো। যতক্ষণ খেয়াল কলবে থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহতায়ালাকে মনে থাকবে, যখনই খেয়াল কলব থেকে বের হয়ে যাবে, তখনই আল্লাহকে ভুলে যাবে। নামাজের সময় যদি আল্লাহকেই মনে না থাকে, তবে কাকে সিজদা করছো? তা চিন্তা করে দেখ। আল্লাহর হুজুরে তোমরা অল্প সময়ের জন্যই দাঁড়িয়ে থাকো, সুতরাং এ সামান্য সময়ের জন্য মন ও মুখ এক করে আল্লাহতায়ালাকে সিজদা করো।
রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর মহব্বতই প্রকৃত ইমান। ৯. রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর মহব্বত যার অন্তরে যতটুকু তার ঈমানও ততটুকু।
যদি তোমরা আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-এর মুহব্বত অন্তরে সৃষ্টি করতে চাও, তবে কামেল পীরের সহচার্য সন্ধান কর।
কলব আল্লাহতায়ালার ভেদের মহাসমুদ্র এবং এ কলবের মধ্যেই আল্লাহতায়ালার নিদর্শনসমূহ লাভ করা যায়। যেমন ক্ষুদ্র একটি বটের বীজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আর একটি বটগাছ। তেমনি আল্লাহতায়ালা মানব দেহের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন। কিন্তু নফসের কু-খায়েশের কারণে মানব দেহের অন্তরাত্মা ময়লাযুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহতায়ালার ভেদের নিদর্শনসমূহ অনুধাবন করতে হলে এবং তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে হলে, কলবকে আয়নার মতো স্বচ্ছ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত

আল্লাহতায়ালার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে না পারবে, ততক্ষণ তোমার আত্মা অতৃপ্ত থাকবে এবং যখন তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবে, তখন তোমার অন্তরাত্ম এক অনাবিল শান্তির অধিকারী হবে।
যখন তুমি তোমার ময়লা দিলকে পীরে কামেলের পবিত্র দিলের সঙ্গে মিশাতে পারবে, সে মুহূর্তে তোমার অন্ধকার দিল আল্লাহর নূরে আলোকিত হবে।
মুর্শিদে কামেলের পথই প্রকৃত সত্যের পথ এবং গজব থেকে বাঁচার উপায়।
আল্লাহতায়ালাকে পাওয়ার জন্য অনেক দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ তিতিক্ষা ও লোক নিন্দা সহ্য করতে হয়।

মহানবী (সঃ)-এর নূরেই জগত সৃষ্টি

রাওয়াহু আব্দুর রাজ্জাক্ব বিসানাদিহি আন জাবির-ইবনে আব্দুল্লাহি রাদিআল্লাহুতা'লা আনহু ক্বলা ক্বুলতু ইয়া রাসুলাল্লাহি বিআব আন্‌তা ওয়া উম্মি আখ্‌বিরনি আন আউয়্যালি শাইয়িন খালাক্বাহুল্লাহুতা'লা ক্বলাল আশিয়ায়ী ক্বালা ইয়াজাবিরু ইন্নাল্লাহাতা'লা খালাক্বা ক্বাবলাল আশিয়ারী নূরা নাবীয়্যিকা মিন নূরিহি ফাযায়ালা জালিকান নূরু ইয়াদুরু বিল্কবুদরাদী হাইসু শায়াল্লাহুতা'লা ওয়ালাম ইয়াকুন ফি জালিকাল ওক্বাতি লাওহু ওলা ক্বালামুন ওয়ালা জান্নাতুউ ওয়ালা নারুন ওয়ালা মালাকুন ওয়ালা সামাউন ওয়ালা আরদ্বুন ওয়ালা শামসুন ওয়ালা ক্বামারুন ওয়ালা জিন্নিউন ওয়ালা ইনসিউন ফালাম্মা আরাদালাহুতা'লা আন ইয়াখলুক্বাল খালকা কাস্‌সামা জালিকাল নূরা আরবাআতা আজযাইন ফাখালাক্বা মিনাল জুযিইল আউয়্যালিল ক্বালামা ওয়া মিনাস সানিয়িল লাওহা ওয়া মিনাস সালিসিল আরশা সুম্মা ক্বাস্‌সামাল জুযাআর রাবিয়া আরবায়াতা আজযাইন ফাখালাক্বা মিনাল জুযইল আউয়্যালি হামালাতাল আরশী ওয়া মিনাস সানিয়িল কুরসিয়্যা ওয়া মিনাস সালিসি বাক্বিয়াল মালাইকাতি ছুম্মা কাস্‌সামাল জুযয়ার রাবিয়া আরবাআতা আজযাইন ফাখালাক্বা মিনাল আউয়্যালিস সামাওয়াতি ওয়া মিনাস সানিয়িল আরদিনা ওয়া মিনাস সালিসিল জান্নাতা ওয়ান্নারা সুম্মা ক্বাস্‌সামাল ক্বিসমার রাবিয়া আরবায়াতা আজযাইন ফাখালাক্বা মিনাল আউয়্যালি নূরা আবসারিল মু'মিনীনা ওয়া মিনাস সানিয়ি নূ'রা কুলুবিহিম ওহিয়াল মারিফাতু বিল্লাহিতা'লা ওয়া মিনাস সালিসি নূরা উনসিহিম ওয়া-হুয়াত তাওহীদু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রসূলুল্লাহি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। (রওয়াহু মাওয়াহেব)

অর্থ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু-তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস: রাসুল (সঃ)-ইরশাদ করেন যে, যখন আল্লাহ ছাড়া কিছুই ছিল না, তখন আল্লাহ'তায়ালা তাঁর নিজ নূর থেকে তাঁর হাবীব (সঃ)-এর নূর পৃথক করেন। তারপর মহানবী (সঃ)-এর এ নূর চার ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগ দিয়ে 'কলম' দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে 'লাওহে মাহফুজ' এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে আরশ সৃষ্টি করেন। অবশিষ্ট এক ভাগকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগ দিয়ে 'আরশ বহনকারী ফেরেশতা' দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে 'কুরসী' এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে অন্যান্য ফেরেশতা সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় চার ভাগের অবশিষ্ট এক ভাগকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগ দিয়ে 'আসমান' দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে জমিন (পৃথিবী) এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে বেহেশত ও দোযখ সৃষ্টি করেন। অবশিষ্ট একভাগ আবার চারভাগে বিভক্ত করেন। এর প্রথম ভাগ দিয়ে 'মু-মিনদের নয়নের (দৃষ্টিশক্তি) নূর', দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে আল্লাহর মারিফাত 'ক্বলবের নূর' এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে কালেমা তাওহীদ সৃষ্টি করেন এবং অবশিষ্ট একভাগ দিয়ে অন্যান্য জগত সৃষ্টি করেন। (হাদীসে মাওয়াহেব)

উল্লিখিত হাদিস শরীফ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সৃষ্টি জগতের মূল উপাদান হল নবী করিম (সঃ)-এর নূর। অতএব, নবী করিম (সঃ) কোথায় উপস্থিত নেই? সব সময়, সব স্থানে তিনি উপস্থিত-হাজির-নাযির। পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেন, ইন্না-আরসালনা-কা শা-হিদাওঁ ওয়া মুবশ্বিরাওঁ ওয়া নাজিরা (সূরা ফাতাহ, ৪৮:৮)।

অর্থ- (হে হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে হাযির-নাযির বা প্রত্যক্ষকারী সাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী নবী-রাসুল হিসাবে প্রেরণ করেছি (সূরা ফাতাহ্- ৪৮: ৮)।

শাহিদ অর্থ হাযির-নাযির এবং প্রত্যক্ষকারী সাক্ষী। সাক্ষীকে শাহিদ এজন্য বলা হয় যে, তিনি ঘটনাস্থলে হাযির-নাযির অর্থাৎ উপস্থিত ছিলেন। রাসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (মাহবুব) শাহিদ এজন্য বলা হয় যে, তিনি মু'মিনের হৃদয়ে হাযির-নাযির বা উপস্থিত থাকেন (৩৩:৬)। হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাহবুবিয়াত মানব ও যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি আল্লাহতায়ালার মাহবুব এবং আল্লাহতায়ালা সমগ্র জগতের মাহাবুব। শুষ্ক কাঠ, পাথর, পশু-পাখি ইত্যাদি হুজুরের বিচ্ছেদে কান্না করে। স্রষ্টার দরবারে তিনি সৃষ্টির সাক্ষী, সবার ফয়সালা হবে তাঁর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে। সৃষ্টির সামনে স্রষ্টার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আল্লাহতায়ালা হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শনকে সাক্ষ্য সহকারে উল্লেখ করেছেন। হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যক্ষকারী সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী। তিনি মিরাজ শরীফে জান্নাত, দোযখ, ফিরিশতাদের এবং আল্লাহতা'লাকে স্ব-চোখে দেখেছেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের সাক্ষীস্বরূপ প্রেরণ করেছেন, তিনি আমাদের কৃতকর্মের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আমরা কোথায় কি করি, কি ইবাদত করি, কাকে ঠকাই, কার উপর অন্যায় করি, কার উপর জুলম করি, দৈনন্দিন কাজকর্ম সবকিছুরই তিনি প্রত্যক্ষকারী সাক্ষী। হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষী ছাড়া আল্লাহতা'লার কাছে কোন ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। দুনিয়াতে কোন বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় কোন সাক্ষী যদি বলে, লিয়াকত-সৈকতের টাকা চুরি করেছে, তা সে শুনেছে, তবে সাধারণত প্রশ্ন আসে, কার কাছ থেকে শুনেছে? সেক্ষেত্রে যে শুনে সাক্ষ্য প্রদান করে, সে গৌণ হয়ে যায়, মূখ্য থাকেন যার কাছ থেকে শুনে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে। শোনা সাক্ষীর উপর বিচারক কোন ফয়সালা দিতে পারেন না। হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সমস্ত ভাল-মন্দ কাজ ও ইবাদতের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ।

রাসুলে করিম (সঃ) সাক্ষিই যদি না হবেন, তবে তিনি শেষ বিচারের দিনে সাক্ষি এবং শাফাওয়াত করবেন কীভাবে? সাক্ষীদাতাকে অবশ্যই ঘটনার সময় উপস্থিত থাকতে হবে নইলে সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হয় না। অতএব নি:সন্দেহে নবী করীম (সঃ)-উম্মতের সমস্ত ইবাদতের সাক্ষী। সালাতে (নামাজে) তাশাহুদ পাঠ করা ওয়াজিব। সালাতে তাশাহুদে নবী করীম (সঃ)কে হাজির-নাযির বা উপস্থিত জেনেই সালাম দিতে হবে, নইলে সালাতই হবে না। শেষ বিচারের দিনে হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষীর উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের বেহেশত-দোযখের ফয়সালা দিবেন (ফতওয়ায়ে শামী)

কোরআন হাদিস মতে অবশ্যই কামেল পীর-মুর্শিদ ধরতে হবে

কামেল পীরের কাছে বাইয়াত, মুরিদ বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করার বিষয়ে কোরআনের দলিল।

সূরা মায়িদাহ্, আয়াত-৩৫

ইয়া আইয়্যুহাল লাযিনা আ-মানুত্তাকুল্লা-হা ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসীলাতা ওয়া জ্বা-হিদু ফী সাবীলিহী লা'আল্লাকুম তুফ্লিহুন।

অর্থ– হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় কর, তাকে পাবার পথে উছিলা ও মধ্যস্থতা অন্বেষণ বা তালাশ কর। অর্থাৎ উছিলা হলো জামানার কামেল পীর-মুর্শিদগণ এবং আল্লাহর পথে কঠর রিয়াজত ও সাধনা কর এবং জিহাদে আকবর কর। তাহলে আমি তোমাদের সাহায্য করবো, তোমরা সফলকাম হবে।

সূরা ফাতাহ্, ১০ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন,

ইন্নাল্লাযীনা ইউবা-ই'উনাকা ইন্নামা- ইউবা-ই'উনাল্লা-হা; ইয়াদুল্লা-হি ফাওক্বা আইদীহিম্।

অর্থ– হে নবী, যারা আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করল তারা মূলত আমার হাতেই বাইয়াত গ্রহণ করল, আমার হাত তাঁদের হাতের ওপর রয়েছে। এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণ হলো যে, সাহাবীগণ, আসহাবে সুফ্ফাগণ যুগে যুগে বাইয়াত পড়িয়েছেন। তাই এখন পর্যন্ত পীর-মাশায়েকগণ বাইয়াত পড়াচ্ছেন এবং অনাগতকাল ধরে পড়াতে থাকবেন।

রাসুল (স.)-এর পরে আমিরুল মু'মিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত সালমান ফারসী (রা.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত কাসেম বিন মোহাম্মদ বিন আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (কু. ছি. আ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত আবুল হাসান খেরকানী (কু. ছি. আ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত আবু আলী ফারমুদী তুসী (কু. ছি. আ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত খাজা ইয়াকুব ইউসুফ হামদানী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর খাজায়ে খাজেগান হযরত আবদুল খালেক আজদেদানী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত শাহ খাজা মাওলানা আরিফ রেওগিরী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত খাজা মাহমুদ আনজির (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত খাজা শাহ আজীজানে আলী আররামায়তানী (কু. ছি. আ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত খাজা মাওলানা মোহাম্মদ বাবা ছাম্মাছী (কু. ছি. আ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত শাহ আমীর সৈয়দ কালাল (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর শামসুল আরেফীন হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দি বোখারী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত আলাউদ্দিন আত্তার (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত শাহসুফি জাহেদ ওয়ালী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত শাহ দরবেশ মোহাম্মদ (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি খাজেগী এমকাঙ্গী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত খাজা মুহাম্মদ বাকীবিল্লাহ (কু. ছি. আ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর ইমামে রাব্বানী, কাইউমে জামানী, গাউছে

ছামদানী হযরত শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দী মোজাদ্দেদ আল ফেছানী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত শেখ সৈয়দ আদম বিন নূরী (কু. ছি. আ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত সৈয়দ আব্দুল্লাহ আকবারাবাদী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত মাওলানা শেখ আবদুর রহীম মোহাদ্দেছে দেহলভী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত মাওলানা শাহ অলীউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত মাওলানা শাহ সৈয়দ আহমদ বেরলভী (কু. ছি. আ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত শাহসুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত মাওলানা শাহসুফি ফতেহ আলী ওয়ায়েসী রাসুলে নোমা (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী শাহ মেহেদীবাগী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ খাজা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী নক্শবন্দি মোজদ্দেদি (কু. ছি. আ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর মোজাদ্দেদে জামান শাহান শাহে তরিকত হযরত মাওলানা আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরী নক্শবন্দি মোজাদ্দেদি (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর শাহান শাহে তরিকত মোফাছছিরে কোরআন শাহ সুফি আলহাজ্ব হযরত মাওলানা কুতুবুদ্দীন আহমদ খান মাতুয়াইলী (রহ.) নক্শবন্দি মোজদ্দেদি (কু. ছি. আ.) ক্বেবলাজান হুজুর বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর তারই ধারাবাহিকতায় আমার দরদী মুর্শিদের কাছ থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত হয়ে আমি খাকছার জাকির বাইয়াত পড়াচ্ছি এবং ধারাবাহিকভাবে এই বাইয়াতের ধারা কামেল পীর-মুর্শিদের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

সূরা নিছা, রুকু-৮, আয়াত-৫৯

ইয়া আইয়্যুা-হাল্লাযিনা আমানু আত্বি'উল্লা-হা ওয়া আত্বি'উর্ রাসুলা ওয়া-উলিল্ আম্রি মিন্কুম্।

অর্থ– হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করো, তবে তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসুলের অনুগত হও এবং রাসুলের ইত্তেবা, পায়রুবি কর। তোমাদের কওম ও জামানায় যাঁরা সাহেবে হুকুম ও কামেল পীর-মুর্শিদ তাঁদের অনুগত হয়ে যাও এবং তাদের পায়রুবি কর।

রাসুল (স.) ফরমান– 'আস্ শাহিকু ফি কাওমিহি কান্ নাবিয়্যি ফি উম্মাতিহি।'

অর্থ– তোমাদের কওমে (জামানায়) যাঁরা কামেল মুর্শিদ পাবে, তাঁদেরকে রাসুলতুল্য ভলোবাসবে, যেরকম আমার সাহাবাগণ আমাকে ভালোবেসেছেন তদ্রূপ তোমরাও তোমাদের কামেল মুর্শিদকে ভালোবাসবে।

জামেউল উছুল সূরা মোহাম্মাদের তাফসিরে আছে– হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রহ.), যিনি তৎকালীন বিখ্যাত তাফসির-বিশারদ ও তাফসিরে কবীরের লেখক। তিনি হযরত ইমাম ছাঞ্জালী বা নাজিমুদ্দীন কোবরা (রহ.)-এর কাছে মুরিদ হওয়ার জন্য যান। ইমাম ফখরুদ্দীন রাজীর ভিতরে এলেমের কিছুটা ফখর (অহঙ্কার) থাকার কারণে তিনি বলেছেন, আমার কাছে মুরিদ হলে তোমার ইলেম ভুলে যেতে হবে। অর্থাৎ মূর্খের মতো থাকতে হবে। এই কারণে তিনি তার কাছে মুরিদ হলেন না। মৃত্যুর সময় ইবলিস নানা প্রকার ছওয়াল করবে এই চিন্তা করে 'আল্লাহ এক' সম্পর্কে ৩৬০ খানা দলিল মুখস্ত করে রেখেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর (অন্তিমকালে) সময় ইবলিস এসে আল্লাহতায়ালার একত্ববাদ সম্পর্কে প্রশ্ন ও তর্ক-বির্তক আরম্ভ করলে, তিনি ৩৬০ খানা দলিল দ্বারা আল্লাহতায়ালার একত্ববাদ সম্পর্কে প্রমাণ করলেন। ইবলিস যুক্তি-তর্ক দিয়ে তাঁর সব দলিল বাতিল (Cancel)

করে পরে জিজ্ঞাসা করল, হে ফখরুদ্দীন রাজী! তুমি আল্লাহতায়ালার একত্ববাদ সম্পর্কে আর কত দলিল দিতে পারবে? তখন হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী হতবুদ্ধি হয়ে বলেছিলেন, আমি আর দলিল জানি না। যখন তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন তখন হযরত ছাঞ্জালী বা নাজিমুদ্দীন কোবরা (রহ.) রুহানিতে জানতে পেরে তাঁর প্রতি দয়া হয়েছিল। তাই তিনি বলেছিলেন, হে ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী! তুমি বল আমার আল্লাহ বিনা দলিলে এক। তখন ইবলিস বলেছিল, হে ফখরুদ্দীন রাজী তোমার পিছনে যদি কামেল পীর না থাকত তবে আমি দেখতাম, তুমি কেমন করে ইমান নিয়ে কবরে যাও। এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হলো, ইমাম ফখরুদ্দীন রাজীর মতো জগৎ বিখ্যাত এক আলেম এবং ইমাম হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুকালে কামেল পীরের সাহায্য ছাড়া ইমান নিয়ে কবরে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। তবে কেমন করে বর্তমান জামানার মৌলভী, হাফেজ, ক্বারী, পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও সুশীলসমাজসহ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, কামেল পীর ছাড়া ইমান নিয়ে কবরে যাওয়ার আশা করেন? সম্মানিত পাঠকগণ, এই বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন।

বেলায়েতের প্রমাণ

সূরা কাহাফ, আয়াত– ৬০-৮০)

'ওয়া ইয্ ক্ব-লা মূসা লিফাতা-হু লা আব্রাহু হ্াত্তা আব্লুগা মাজ্মাআ'ল্ বাহ্রাইনি আও আমদ্বিয়া হুক্কুবা। ফালাম্মা বালাগা মাজ্মাআ' বাইনিহিমা নাসিয়া হুতাহুমা ফাত্তাখাযা সাবীলাহূ ফিল্ বাহ্রি সারাবা। ফালাম্মা জ্বা-ওয়াযা ক্বলা লিফাতা-হু আ-তিনা গদা-আনা, লাকাদ্ লাক্বীনা-মিন্ সাফারিনা হা-যা নাছবা। ক্বলা আরআইতা ইয্ আওয়াইনা- ইলাছ্ ছাখ্রাতি ফাইন্নী নাসীতুল্ হুতা, ওয়ামা আনসা নীহু ইল্লাশ্ শাইত'নু আন্ আয্কুরাহূ, ওয়াত্তাখাযা সাবীলাহূ ফিল্ বাহ্রি, আজ্বাবা। ক্ব-লা যা-লিকা মা-কুন্না নাব্গি, ফার্তাদ্দা আ'লা- আ-ছা-রিহিমা- ক্বাছছা। ফাওয়াজ্বাদা আবদাম্ মিন্ ইবা দিনা- আতাইনা-হু রহ্মাতাম্ মিন্ ইনদিনা ওয়া-আ'ল্লাম্না-হু মিল্লাদুন্না-ইল্মা। ক্ব-লা লাহূ মূসা হাল্ আত্তাবিউ'কা আলা আন্ তুআ'ল্লিমানি মিম্মা উ'ল্লিম্তা রুশ্দা। ক্ব-লা ইন্নাকা লান্ তাস্তাত্বীআ' মাই'য়া ছব্রা। ওয়াকাইফা তাছ্বিরু আ'লা-মা-লাম্ তুহিত্ব বিহী খুব্রা। ক্ব-লা সাতাজ্বিদুনী ইন্শা আল্লাহু ছ-বিরাওঁ ওয়ালা-আ'ছীলাকা আমরা। ক্ব-লা ফাইনিত্তাবা'তানী ফালা তাস্আল্নী আ'ন শাইয়িন্ হ্াত্তা উহ্দিছা লাকা মিন্হু যিক্রা। ফানত্বলাক্বা, হ্াত্তা-ইযা রাকিবা ফিস্সাফীনাতি খারাক্বাহা; ক্ব-লা আখরাক্বতাহা লিতুগরিক্বা আহ্লাহা, লাক্বাদ্ জ্বি'তা শাইআন্ ইম্রা। ক্ব-লা আলাম্ আকুল ইন্নাকা লান্ তাস্তাত্বীআ' মাই'ইয়া ছব্রা। ক্ব-লা লা তুআ-খিয্নী বিমা নাসীতু ওয়ালা তুর্হিক্বনী মিন আমরী উ'সরা। ফানত্বলাক্বা, হ্াত্তা-ইযা লাক্বিয়া গুলা-মান্ ফাক্বতালাহূ, ক্ব-লা আক্বাতাল্তা নাফ্সান যাকিয়্যাতাম বিগইরি নাফসিন; লাক্বাদ জ্বি'তা শাইয়ান নুক্রা। ক্ব-লা আলাম্ আকুল্ লাকা ইন্নাকা লান্ তাস্তাত্বীআ' মাই'ইয়া ছব্রা। ক্ব-লা ইন সাআলতুকা আ'ন্ শাইয়িম্ বা'দাহা-ফালা- তুছ্-হ্বিনী, ক্বাদ বালাগ্তা মিল্লাদুন্নী উ'য্রা। ফান্ত্বলাক্বা, হ্াত্তা- ইযা-আতাইয়া- আহ্লা ক্বারইয়াতি নিস্তাত্বআ'মা- আহ্লাহা ফাআ-বাও আইঁ ইউদ্বয়্যিফূহুমা- ফাওয়াজ্বাদা- ফীহা জ্বিদা-রাই ইউরীদু আইঁ ইয়ানক্বাদ্দা ফাআক্বা-মাহু; ক্ব-লা লাও শি'তা লাত্তাখায্তা আ'লাইহি আজ্বরা। ক্ব-লা হা-যা ফিরা-কু বাইনী ওয়াবাইনিকা, সাউনাব্বিউকা বিতা'উয়ীলি মা-লাম্ তাস্তাত্বি' আলাইহি ছব্রা। আম্মাস্ সাফীনাতু ফাকা-নাত্ লিমাসা-কীনা ইয়া'মালূনা ফিল বাহ্রি ফাআরাত্তু আন্ আ'ঈবাহা ওয়াকা-না ওয়ারা-আহুম মালিকুই ইয়া'খুযু কুল্লা সাফীনাতিন্ গাছ্বা। ওয়া আম্মাল্ গুলা-মু ফাকা-না আবাওয়া-হু মু'মিনাইনি ফাখাশীনা-আইইউরহিক্বাহুমা তুগইয়া নাত্তঁ ওয়া কুফ্রা। ফা আরাদ্না- আইঁইউব্দিলাহুমা-রব্বুহুমা- খইরাম্ মিনহু যাকা-তাওঁ

ওয়া আক্বরাবা রুহ্মা। ওয়া আম্মাল্ জ্বিদা-রুফাকা-না লিগুলা-মাইনি ইয়াতীমাইনি ফিল মাদীনাতি ওয়া কা-না তাহ্তাহূ কানযুল্লাহুমা ওয়া কা-না আবূহুমা ছ-লিহ্ান, ফাআরা-দা রব্বুকা আইঁইয়াব্লুগা-আশুদ্দাহুমা- ওয়া ইয়াস্তাখ্রিজ্বা- কান্যাহুমা, রহ্মাতাম্ মির্ রব্বিকা, ওয়ামা ফাআ'ল্তুহূ আ'ন আম্রী; যা-লিকা তা'উয়ীলু মা-লাম তাছ্ত্বি' আলাইহি ছব্রা।

হযরত মুসা (আঃ) ও খিযিরের কাহিনী

সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়াতে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ– রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, একদিন হযরত মুসা (আঃ) বনী ইসরাইলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, সব মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? হযরত মুসা (আঃ)-এর জানামতে তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিলেন না। তাই বললেন, আমিই সবার চাইতে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই এ জবাব তিনি পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়াই ছিল 'আদব'। অর্থাৎ– একথা বলে দেয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ তায়া'লাই ভালো জানেন, কে অধিক জ্ঞানী। এ জবাবের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসা (আঃ)-কে তিরস্কার করে অহী নাযিল হল– দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী। এ কথা শুনে মুসা (আঃ) প্রার্থনা জানালেন, তিনি অধিক জ্ঞানী হলে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত। তাই বললেন, ইয়া আল্লাহ! আমাকে তাঁর ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ বললেন, থলের মধ্যে একটি ভাজা মাছ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের মিলনস্থলের দিকে সফরের উদ্দেশে যাত্রা করুন। যেখানে পৌঁছার পর থলের ভাজা মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার সাক্ষাৎ পাবেন। মুসা (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ মতো থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর খাদেম ইউশা ইবনে নুনও ছিলেন। পথিমধ্যে একটি প্রস্তর খণ্ডের ওপর মাথা রেখে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি মু'জেযা প্রকাশ পেল যে, মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ তায়া'লা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন, ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল। ইউশা ইবনে নুন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করছিলেন। মুসা (আঃ) নিদ্রায় ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা ইবনে নুন মাছের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর কাছে বলতে ভুলে গেলেন এবং সেখান থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন-একরাত সফর করার পর সকালবেলায় মুসা (আঃ) খাদেমকে বললেন, আমাদের নাশতা আনো। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নুনের ভাজা মাছের ঘটনা মনে পড়ল। সে ভুলে যাওয়ার ওযর পেশ করে বললেন, শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর বললেন, মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেল। তখন মুসা (আঃ) বললেন, সে ঘটনাটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। অর্থাৎ– মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানটি ছিল গন্তব্যস্থল। সে মতে তৎক্ষণাৎ তাঁরা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্য পূর্বের পথ ধরেই চললেন। প্রস্তর খণ্ডের কাছে পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছেন। মুসা (আঃ) সেই অবস্থানেই তাঁকে সালাম করলে খিযির (আঃ) বললেন, এই জনমানবহীন প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল? মুসা (আঃ) বললেন, আমি মুসা। হযরত খিযির প্রশ্ন করলেন, বনী ইসরাঈলের মুসা? তিনি জওয়াব দিলেন, হ্যাঁ আমিই বনী ইসরাঈলের মুসা। আমি আপনার কাছ থেকে এ বিশেষ

জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ তায়া'লা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত খিযির বললেন, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। হে মুসা! আমাকে আল্লাহতায়ালা এমন এক জ্ঞান দান করেছেন যা আপনার কাছে নেই। পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি না। মুসা (আঃ) বললেন, ইনশা আল্লাহ! আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোনো কাজে আপনার বিরোধিতা করব না। হযরত খিযির (আঃ) বললেন, যদি আপনি আমার সঙ্গে থাকতেই চান, তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না। যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার স্বরূপ বলে দিই। একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে গেল। তাঁরা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা হযরত খিযিরকে (আঃ) চিনে ফেলল এবং কোনো রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই খিযির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে হযরত মুসা (আঃ) স্থির থাকতে পারলেন না । বললেন, তারা কোনো প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এর প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙে দিলেন, যাতে সবাই ডুবে যায়? এতে আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। খিযির (আঃ) বললেন, আমি পূর্বেই বলেছিলাম আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। তখন মুসা (আঃ) ওযর পেশ করে বললেন, আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না। রাসুলুল্লাহ (সঃ) এ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়েছিল (ইতিমধ্যে) একটি পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। হযরত খিযির মুসা (আঃ)-কে বললেন, আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান উভয় মিলে আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের মোকাবিলায় এমন তুলনাও হয় না, যেমনটি এ পাখির চঞ্চুর পানির সঙ্গে রয়েছে সমুদ্রের পানি। অতঃপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কূল ধরে হাঁটতে লাগলেন। হঠাৎ হযরত খিযির একটি বালককে অন্য বালকদের সঙ্গে খেলা করতে দেখলেন। হযরত খিযির (আঃ) স্বহস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিছিন্ন করে দিলেন। বালকটি মরে গেল। মুসা (আঃ) বললেন, আপনি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে গোনাহর কাজ করলেন। হযরত খিযির (আঃ) বললেন, আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। মুসা (আঃ) দেখলেন এ বিষয়টি পূর্ব অপেক্ষা গুরুতর। তাই বললেন, এরপর যদি প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। আমার ওযর-আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় এক বাড়িতে গেলেন এবং তাদের কাছে পানি চাইলেন; কিন্তু ওরা সোজা না করে দিল। ওই বাড়িতেই হযরত খিযির (আঃ) একটি ভাঙা দেয়াল দেখতে পেলেন এবং অন্য জায়গা থেকে পানি এনে তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটি মেরামত করে দিলেন। মুসা (আঃ) অবাক হয়ে বললেন, আমরা তাদের কাছে পানি চাইলে তারা দিতে না করল অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন। ইচ্ছা করলে তাদের কাছে থেকে পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন। হযরত খিযির (আঃ) বললেন,

এখন শর্ত পূরণ হয়েছে। এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়। এরপর খিযির (আঃ) উপরোক্ত তিনটি ঘটনার স্বরূপ মুসা (আঃ)-এর কাছে বর্ণনা করে বললেন। অর্থাৎ, এ হচ্ছে সেসব ঘটনার স্বরূপ, যেগুলো দেখে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি। রাসুলুল্লাহ (স.) সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, মুসা (আঃ) যদি আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকতে পারতেন, তবে আরও কিছু জানতে পারতেন।

সূরা কাহাফে খিযির (আঃ) ও মুসা (আঃ)-এর ঘটনায় বুঝা গেল এত বড় একজন জলিলুল কদর নবী, যাঁর সঙ্গে আল্লাহ তায়া'লার কথা হতো, যার মাঝখানে কোনো বাহক জিব্রাইল বা ফেরেশতা ছিল না। মুসা (আঃ)-এর মতো এত বড় দলিল-জলিল-কদর নবী হওয়ার পরেও একজন আল্লাহর বান্দা বা কামেল অলির কাছে তাকে যেতে হয়েছিল ইলমে মারেফতের জ্ঞান হাসিল করার জন্য।

কাজেই হে সম্মানিত পাঠকগণ! আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, এই ইলমে লাদুন্নী বেলায়েত ও মারেফতের জ্ঞান যেসব কামেল পীর-মাশায়েকের কাছে বা অন্তরে আছে, তাদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন আছে কি না।

তাসাউফ ও মারেফতের জ্ঞান ছাড়া অন্তরের রোগ দূর হয় না

মানুষের স্থূল দেহের রোগমুক্তি ও পুষ্টিসাধনের জন্য যেমন নানা প্রকার ওষুধ ও পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন, সে রকম পরমাত্মারও (রুহে ইনসানীরও) ওষুধ ও পুষ্টিকর খাদ্যের আবশ্যক। পরমাত্মা আজ উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, পুনরায় চেতনা ফিরে না পাওয়া বা আত্মাকে রোগমুক্ত না করার কারণে দুর্বলতায় আত্মার ক্ষুধামন্দা হয়েছে। এর ফলে ওই আত্মার কাছে ধর্মের সুমধুর বাণী শুনতে অরুচি। ধর্মের বাণী তিক্ত জ্বালাময় বোধ হয়। তাই সে ধর্মীয় কাজের বিপরীত অবস্থানে রুগ্ন ব্যক্তির মতো কুপথ্য স্বরূপ ধর্মবিরোধী গর্হিত কাজ বা বাক্য শ্রবণ করে। এখন সে জীবন্মৃত অবস্থায় দিন দিন কুপথে অগ্রসর হচ্ছে। কাজেই এলমে তাসাউফ ছাড়া এমন আত্মাকে সুপথে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব।

আত্মার এই রোগমুক্তির জন্য আল্লাহতায়া'লা সুব্যবস্থাও করেছেন। আল্লাহ বলছেন, আমি বান্দাদের মধ্যে এমন একদল লোক সৃষ্টি করেছি, যারা লোকদিগকে সৎ রাস্তা বা সরল পথ দেখিয়ে থাকে।

যেমন: 'অমিম-মান খালক্না উম্মাতাই ইহাহ্-দূনা বিল হাক্কি'

অর্থাৎ আমার সৃষ্টির মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় আছে, যারা মানুষকে সৎ পথ দেখিয়ে থাকে, রাসুল করিম (সঃ) এরূপ হেদায়েতকারী হাদিদের আগমনের শুভ সংবাদ দিয়েছেন।

যথা: 'ইন্নাল-লাহা আজ্বাযা ওয়া জাল্লা ইয়াব আসূ লিহা-যিহিল উম্মাতি আলা রা-আছি কুল্লি মিয়াতি মিন ছানাতি ইয়াজদাদু লা-হুমা দিনূহা'(রাওয়াহু-আবু দাউদ)

অর্থাৎ নিশ্চয় মহান আল্লাহতায়ালা একশ বছর পর পর তাঁর বান্দাদের জন্য, এমন এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেন, যিনি দ্বীনকে (ধর্মকে) তাজা (সজীব ও সতেজ) করেন। আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেছেন রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর ভিতরে এমন এক স্বর্গীয় শক্তি নিহিত ছিল যে, তাঁকে দেখলে মানব হৃদয় সহজেই প্রেমরসে বিগলিত হয়ে যেত এবং পাপের বাসনা দূর হয়ে মুহূর্তেই মানুষ পূর্ণ ঈমানদার তথা আল্লাহর পিয়ারা বা আশেক হয়ে যেত। মোজাদ্দেদগণ রাসুলুল্লাহর সেই নিয়ামত নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন। সুতরাং তিনিও মোজাদ্দেদ, তিনি যখন মানবকে আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-এর বাণী শুনান তখন মানব হৃদয় প্রেমরসে গলে যায় এবং পাপের বাসনা দূর হয়ে মুর্দাদিল জিন্দা হয়; মুহূর্তেই সে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার ও আল্লাহ-রাসুলের আশেক-প্রেমিক হয়ে যায়। আবার যখন মোজাদ্দেদ পৃথিবী থেকে চলে যান তখন তাঁর অধীনস্থ আউলিয়াদের পরম্পরায় রাসুলুল্লাহর (সঃ)-এর ওই (গুণ) চলতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওই এশ্ক ও মহব্বত কমতে থাকে। মানুষ তখন আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-এর এশ্ক-মহব্বত হারিয়ে দিন দিন কুপথে ধাবিত হতে থাকে। কোরআন-হাদিসের বাণী ও ওয়াজ-নসিহত শোনে কিন্তু তা আমলের সময় আমল করে না। শুধু নফস আম্মারার বশবর্তী হয়ে নানা প্রকার পাপকাজে লিপ্ত হয়ে যায়। মোটকথা পৃথিবী যখন অনাচার অত্যাচার ব্যভিচারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়, আল্লাহতায়া'লা দয়া করে ওই সময় দ্বীনকে তাজা বা সজীব করার জন্য, আর একজন মোজাদ্দেদ পাঠান দুনিয়ার বুকে। এইভাবে একশ বছর পর পর মোজাদ্দেদ পাঠিয়ে দ্বীনকে তাজা বা সজীব রাখবেন। রাসুল (সঃ)-এর পর কিয়ামত পর্যন্ত জগতে আর কোন পয়গম্বর বা নবী আসবেন না। সুতরাং মোজাদ্দেদ ও তাঁর অধীনস্থ আউলিয়াদের দ্বারাই পয়গম্বরের কাজ চলতে থাকবে।

তাসাউফ সম্পর্কে হযরত ইমাম মালেক (রহ.) বর্ণনা করেছেন– 'মান তাসাওউফা ওয়ালাম ইয়াতাফাকাকাহু, ফাক্বদ তাযানদাক্বা, ওয়া মান তাফাক্বাহা-ওয়ালাম ইয়া-তাসাওউফ ফাক্বদ তাফাস্-সাক্বা, ওয়া মান জামাআ বাইনাহুমা ফাক্বাদ তাহাক্বাকা'
অর্থাৎ : যে ব্যক্তি তাসাউফ অর্জন করল ফিকাহ (শরীয়ত) ছাড়া, সে জিন্দিক (কাফের)। যে ব্যক্তি শুধু ফিকাহ (শরীয়ত) অর্জন করল, তাসাউফ ছাড়া, সে ফাসেক (মিথ্যাবাদি)। আর যে এই দুটোই অর্জন করল, সে পূর্ণ মুমিন। (মেরক্বাত শরীফ)
এ থেকে বোঝা যায়, শরিয়ত আর তাসাউফ পাশাপাশি। তাই একজন পূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য এই দুটি বিষয়ই অর্জন করা প্রয়োজন। মোটকথা শরিয়ত ছাড়া তাসাউফ (মারেফত) পূর্ণ হয় না, মারেফত ছাড়া ফিকাহ্ (শরিয়ত) পূর্ণ হয় না।
'আশ্শরীয়াতু আকওয়ালী, আত্তারীক্বাতু আফওয়ালী, আল হাক্বীকাতু আহ্ওয়ালী, আল মারেফাতু আছরারী'
অর্থাৎ হযরত রাসুলে করিম (সঃ) বলেন, শরিয়ত আমার বাক্য, তরিকত আমার কাজ, হাক্বিকত আমার অবস্থান এবং মারেফত আমার নিগূঢ় রহস্য।
তাই আত্মাকে খোরাক দানের মধ্যেই সুখ-শান্তি নির্ভরশীল। মুর্শিদের সরণে বা মোরাকাবা থেকেই মুরিদের হৃদয়ে মহব্বত সৃষ্টি হয়। এমন সরণ বা মোরাকাবাই আত্মার প্রকৃত খোরাক। এতে আত্মা যেমন সজীব-সতেজ ও শক্তিশালী হয়, তেমনি নির্মল, নিরোগ ও পাপমুক্ত থাকে। মুর্শিদের সরণ বা মোরাকাবা থেকে বিরত থাকলেই, আত্মার উপবাস বা আত্মা দুর্বল হয়ে যায়। তখন নানান পাপ, রোগ, অশান্তি আত্মায় প্রবেশ করে আক্রমন করতে থাকে। আর তখন এভাবেই আত্মা কলুষিত হয়ে যায়।

ইসলাম ধর্মে যত প্রকার প্রার্থনা উপাসনা আছে তার মধ্যে নামাজই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত

ইসলাম ধর্মে যত প্রকার প্রার্থনা, আরাধনা, উপাসনা, রিয়াজত, সাধনা, জিকির-আজকার যা কিছু আছে; তার মধ্যে নামাজই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। সালাত অর্থ রহমত, দোয়া, প্রশংসা, জিকির স্মরণ ইত্যাদি যা আরবিতে বলা হয় 'সালাত'। ফার্সিতে বলা হয় নামাজ, বাংলায় বলা হয় প্রার্থনা এবং ইংরেজিতে বলা হয় (prayer)। আল্লাহ তায়া'লা বান্দাদের ওপর তৌহিদের পর নামাজের চেয়ে বেশি প্রিয় আর কোনো জিনিস ফরজ করেননি।

আল্লাহ তায়া'লা পবিত্র কোরআনে ফরমাইয়াছেন–

সূরা আনকাবূত, আয়াত-৪৫

ইন্নাছ্ ছ্বালা-তা তান্হা আনিল ফাহ্শা-ই ওয়াল মুনকারি

অর্থ: নিশ্চয়ই নামাজ, অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

সূরা বাকারাহ, আয়াত- ৭

খাতামাল্লা-হু আলা-কুলূবিহিম; ওয়া আ'লা-সাম্ই'হিম্; ওয়া-আলা আব্ছা-রিহিম্ গিশা ওয়াতুওঁ, ওয়ালাহুম আ'যা-বুন আ'জীম

অর্থ: আল্লাহ তাদের অন্তরে ও তাদের কানে মোহর মেরে দিয়েছেন, তাদের চক্ষুর ওপর পর্দা রয়েছে, তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি ও ওয়াইল দোজখ।

হাদিস

আস্সালাতু মিরাজুল মু'মিনিন্

অর্থ: নামাজ মুমিনের জন্য মিরাজ (যার বাংলা অর্থ হলো দেখা বা সাক্ষাৎ)।

তাফসিরে ইবনে কাছির, হাদিসে জিব্রিলে বর্ণনা আছে– আন্তা বু দুল্লাহা কা-আন্নাকা তারাহু ফা-ইল্লাম তাকুন্ তারাহু ফা-ইন্নাহু ইয়া রাক'।

অর্থ: তুমি এমনভাবে সালাতে দণ্ডায়মান হও ও সালাত আদায় কর, যেন তুমি আল্লাহকে দেখতেছ, যদি তুমি দেখতে অক্ষম হও, কিংবা দেখতে না পাও, তাহলে মনে কর আল্লাহ আমি তোমাকে দেখতেছি।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, লাম্ আ-বুদ্ রাব্বা লাম্ আ-রা-হু

অর্থ: আমি এমন প্রভুর উপাসনা করি না, যাঁকে আমি দেখি না।

এই দর্শন প্রসঙ্গে হযরত উমর (রা.) ও এরূপ দর্শন লাভের দাবি করিয়া বলিয়াছেন, রায়া ক্বল্বি রাব্বী বিনূরি রাব্বী

অর্থ: আমার প্রভু প্রদত্ত নূরের দ্বারা আমার ক্বল্ব আমার প্রভুকে দেখিয়াছে। (সূত্র: সির-রুল আসরার)

হযরত আনাছ (রা.) হইতে হাদিসে রেওয়াত আছে যথা– ইন্নামাল্ মু'মিনিনা ইজাকানা ফিস্ সালাতি ফা-ইন্নামা ইউনাজি রাব্বাহু

অর্থ: নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি নামাজের মধ্যে তাহার পালনকর্তার সহিত কথোপকথোন করিয়া থাকে।

রাসুল (সঃ) ফরমান– লা-সালাতা ইল্লাবি হুজুরী ক্বল্ব। অর্থ: হুজুরী দিল ব্যতীত নামাজ শুদ্ধ হয় না।

সূরা মাউন, আয়াত ১-৭

১. আরআইতাল্ লাযী ইউকায্যিবু বিদ্দীন

অর্থ: আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচার দিবসকে অস্বীকার করে।

২. ফাযা-লিকাল লাযী ইয়াদু'য়্যল ইয়াতীম
অর্থ: সে সেই ব্যক্তি, যে এতিমকে দরজা থেকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়।
৩. ওয়ালা- ইয়াহুদ্দু আ'লা-ত্বআ'-মিল মিস্কিন
অর্থ: সে নিজেও দান করে না, অন্যকেও দান করতে উৎসাহিত করে না।
৪. ফাওয়াইঁলুল্ লিল্ মুছাল্লীন
অর্থ: সুতরাং দুর্ভোগ সেই সমস্ত নামাজীর।
৫. আল্লাযীনা হুম আ'ন ছালা-তিহিম সা-হূন
অর্থ: যাদের নামাজে মন বসে না।
৬. আল্লাযীনা হুম ইয়ূরা-ঊনা
অর্থ: যারা তেমন নামাজ পড়ে; লোক দেখানোর জন্য পড়ে।
৭. ওয়া ইয়াম্না'ঊনাল মা-ঊন।
অর্থ: নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।
তাই যদি কেউ আল্লাহকে লাভ করতে চান, দেখতে চান, পেতে চান ও মেরাজ বা দর্শন করতে চান, তাহলে প্রত্যেক নর-নারীকে অবশ্যই সালাত আদায় করতে হবে। কেননা ইতিহাসে দেখা যায়, সকল নবী-রাসুল ও অলী-আউলিয়াগণ সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়া'লার নৈকট্য লাভ করেছেন।
হাদিসে কুদসিতে এরশাদ করা হয়েছে–
মা ইয়া যালু আবদি ইয়া তাকাররাবু ইলাইয়া বিন নওয়াফিলি হাত্তা আহাবাব তুহু ফা ইযা আহাবাব তুহু ফাকুনতু সাময়ু হুল্লাযী ইয়াসমাউ বিহী ওয়া বাছারু হুল্লাজী ইয়াবছুরু বিহী ওয়া ইয়াদাহুল্লাতী ইয়াবতিশু বিহা ওয়া রিজলু হুল্লাতী ইয়ামশী বিহা
অর্থ: বান্দা যখন নফল ইবাদতের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তখন আমি তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করি। যখন আমি তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যে কান দিয়ে সে শোনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই, যে চোখ দিয়ে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই, যে হাত দিয়ে সে ধরে, আমি তার পা হয়ে যাই, যে পা দ্বারা সে হাঁটে।

কোরআন-হাদিস মতে ছদকা ও মান্নতের বিধান

যমযম কূপ বিলুপ্ত হওয়ার পর দয়াল নবীজির দাদা খাজা আবদুল মোত্তালিব যমযম কূপ আবিষ্কার করার জন্য স্বপ্নে আদেশপ্রাপ্ত হলেন। একই স্বপ্ন বারবার দেখার পর আল্লাহতায়ালা জানিয়ে দিলেন, প্রভাতে এক স্থানে পিপিলিকার বাসা দেখিতে পাইবে এবং কাক ঠোঁট দ্বারা মাটি খুঁড়িতেছে'। খাজা আবদুল মোত্তালিব সেই জায়গায় এসে বাস্তবে দেখতে পেলেন এবং হারেসকে সঙ্গে নিয়ে মাটি খনন করতে লাগলেন। এইস্থানে অল্পকিছু মাটি খননের পরেই কূপের মুখ বের হলো, খাজা আবদুল মোত্তালিব আল্লাহর নামের ধ্বনি দিয়ে কূপের ভিতর থেকে দুটি স্বর্ণের হরিণ, তরবারি ও লৌহবর্ম উত্তোলন করলেন। এসব মালামাল নিয়ে কোরাইশদের অন্যান্য গোত্রের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হলো। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আবদুল মোত্তালিব লটারির প্রস্তাব করায় সবাই রাজি হলো। লটারি শুরু হলো। লটারিতে স্বর্ণ-হরিণ দুটি কাবা গৃহের নামে উঠল এবং অস্ত্রসমূহ আবদুল মোত্তালিবের নামে উঠল। কোরাইশগণ ফাঁকা গেল। এসব ঘটনার পর নিজে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য আবদুল মোত্তালিব আল্লাহর দরবারে দশটি পুত্রসন্তান লাভের আশায় মান্নত করলেন– আমার দশটি পুত্রসন্তান হলে একটি সন্তান আল্লাহর নামে কোরবানি করব। আল্লাহতায়ালা তাঁর মান্নত কবুল করে দশটি পুত্রসন্তান দান করলেন। আল্লাহতায়ালার কুদরতে আবদুল মোত্তালিব একে একে দশটি পুত্রসন্তান লাভ করলেন, সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র হলেন খাজা আবদুল্লাহ এবং তাঁর বয়স হওয়ার পর আবদুল মোত্তালিবের মান্নত পূরণ করা জরুরি হয়ে পড়ল। একদিন তিনি তার সব পুত্রকে ডেকে মান্নত আদায়ের বিষয় জ্ঞাত করলেন এবং একজনকে কোরবানির জন্য নির্ধারিত করার উদ্দেশ্যে লটারি করলেন। লটারিতে খাজা আব্দুল্লাহর নাম উঠল। পিতা-পুত্র উভয়ে মান্নত পূরণের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং আবদুল মোত্তালিব এক হাতে ছুরি, অপর হাতে আবদুল্লাহকে নিয়ে কোরবানির স্থানের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। সেকালে মদিনায় একজন বিশিষ্ট ঠাকুরাণী ছিল। আবদুল মোত্তালিব কতিপয় লোকসহ ঠাকুরাণীর কাছে কোরবানির বিষয় জানালে তিনি পরে আসতে বললেন। সে যুগের প্রথা অনুযায়ী একজন মানুষের জীবনের বিনিময় ছিল দশটি উট। অতএব, ঠাকুরাণী ফয়সালা করলেন দশটি উট এবং আবদুল্লাহ উভয়ের মধ্যে লটারি হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত খাজা আবদুল্লাহর নাম পরিবর্তন হয়ে উটের নাম না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত উটের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। লটারিতে উটের সংখ্যা বাড়তে থাকল। যখন একশ উট পূর্ণ হলো তখন খাজা আবদুল্লাহর নাম না এসে একশ উটের নাম উঠল। তখন একশ উট কোরবানি করে দিলেন এবং খাজা আবদুল্লাহ বেঁচে গেলেন। এখানে প্রকাশ থাকে যে, মান্নতের কারণেই খাজা আবদুল্লাহকে আল্লাহতায়ালা বাঁচিয়ে দিলেন।

উল্লিখিত ঘটনায় প্রমাণ হলো যে, কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী অলি-আল্লাহদের দরবারে আল্লাহর রাস্তায় কোনো কিছুর নিয়তে মান্নত করা বিলকুল জায়েজ।

মান্নত বা ছদকা প্রমাণ হওয়ার বিষয়ে কোরআনের দলিল–

হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর জবানের কথা, যখন তিনি আল্লাহতায়ালার নবী হিসেবে বাইতুল মোকাদ্দাসের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা-যত্নের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, তখন বনী ইসরাইলের হেনা নামে এক নেককার ও ধর্মভীরু মহিলা ছিলেন তাঁর স্বামীর নাম ছিল ইমরান। কথিত আছে যে, হেনার এক বোনকে হযরত জাকারিয়া (আঃ) বিবাহ

করেছিলেন। সে সূত্রে হেনা হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর শ্যালিকা। তখন তিনি আল্লাহর দরবারে মান্নত করেন।
সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৩৫
ইয ক্ব-লাতিম রাআতু ইমরা-না রাব্বি ইন্নী নাযারতু লাকা মা-ফী বাত্বনী মুহাররারান ফাতাক্বাব্বাল মিন্নী, ইন্নাকা আনতাস সামী'উল আলীম।
অর্থ– ইমরানের স্ত্রী বললেন, তাঁর গর্ভে যে সন্তান আছে, সে ভূমিষ্ঠ হলে তাকে বাইতুল মোকাদ্দাসের সেবক হিসেবে উৎসর্গ করবেন সুতরাং আমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
যাঁদেরকে এভাবে মান্নত করা হতো, তাঁরা সারাজীবন বাইতুল মোকাদ্দাসের সেবায় এবং ইবাদাত-বন্দেগির মাধ্যমে নিজ নিজ জীবন অতিবাহিত করত। এ ধরনের নিয়মের কারণে বাইতুল মোকাদ্দাসের খাদেম ও সেবকের সংখ্যা ছিল অনেক। তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাদির জন্য মুসলমানগণ উদার হস্তে দান করতেন। সেবকের সংখ্যা যত বেশি হোক না কেন, তাদেরকে কোনো দিন অসহায় বা অভাবে দিন কাটাতে হয়নি।
হেনা গর্ভধারণের নয় মাস পরে একটি কন্যাসন্তান প্রসব করলেন এবং তার নাম রাখলেন 'মরিয়ম'; কিন্তু মান্নতের বিষয়ে তিনি খুব নিরাশ হলেন। কারণ ইতোপূর্বে কোনো কন্যাসন্তান বাইতুল মোকাদ্দাসের সেবক হিসেবে কেউ দান করেননি। তাই বিষয়টি হেনার কাছে নৈরাশ্যজনক বলে বোধ হয়েছে। তার ধারণা ছিল হয়ত কন্যাসন্তানকে আল্লাহতায়ালা সেবক হিসেবে কবুল করবেন না এবং মসজিদের প্রধান কর্মকর্তাবৃন্দও এতে সম্মতি দেবেন না। এমতবস্থায় তিনি বিষয়টি ভেবে খুবই নিরাশ হলেন এবং কেঁদে কাটাতে লাগলেন। আল্লাহ- তায়া'লা তখন হেনাকে উদ্দেশ করে বললেন, হেনা তুমি যা প্রসব করেছ, তা আল্লাহতায়ালা ভালোভাবে জানেন। মরিয়ম পুরুষ না হলেও আল্লাহতায়ালা তাকে কবুল করেছেন এবং তার মর্যাদা যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাকে নবী জাকারিয়া (আঃ)-এর কাছে দাও।
হেনা আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে সান্ত্বনাবাণী পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। অতঃপর সাত বছর পর্যন্ত মরিয়মকে প্রতিপালন করে বড় করে তুললেন। তারপরে একদিন মরিয়মকে এনে হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর কাছে হাজির করে বললেন, হে আল্লাহর নবী, আমি মান্নত করেছিলাম আমার সন্তানকে আল্লাহর ঘরের খেদমতে দিব। দুভার্গ্যবশত আমি একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেছি। তবুও আমার মান্নত ঠিক রাখার জন্য একে আপনার হাতে তুলে দিতে এসেছি। আপনি মেহেরবাণী করে একে কবুল করে নিন।
হযরত জাকারিয়া (আঃ) তখন মসজিদের মুসল্লিগণকে ডেকে বললেন, আপনাদের মধ্যে কে আছেন যে, এ মেয়েটির ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে রাজি আছেন? মুসল্লিগণ মরিয়মের ললাটে এক জ্যোতির্ময় নূর দেখে তাঁর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে সবাই একসঙ্গে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। হযরত জাকারিয়া দেখলেন, সকলেই দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবে কারো হাতে মরিয়মের প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পণ করার মধ্যে এক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। তখন তিনি লটারির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।
তাওরাত কিতাব লেখার কাজে যে কলম ব্যবহার হতো, সে কলমটি এক এক করে সবার হাতে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। এ কলমটি পানিভর্তি এক পাত্রের মধ্যে ছেড়ে দিলে যার হাতের কলম পানিতে ডুববে না, তিনি মরিয়মের প্রতিপালনের দায়িত্ব লাভ করবেন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে এক এক করে পরস্পর পানির পাত্রে কলম ফেলতে আরম্ভ করলেন। একে একে সবার হাতের কলম ডুবে গেল। যখন হযরত জাকারিয়া (আঃ) কলম পানিতে ফেললেন, তখন কলম আর পানিতে ডুবলো না, পানির ওপর ভেসে

থাকল। তখন সবাই হযরত জাকারিয়া (আঃ)কে মরিয়মের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি মরিয়মের জন্য বাইতুল মোকাদ্দাসের একপাশে একটি হুজরা বা কক্ষ নির্ধারণ করে দিলেন। মরিয়ম সেখানে বসে এবাদত-বন্দেগি করবেন এবং শুধু জাকারিয়া (আঃ)-এর বাসায় তিনি যাতায়াত করবেন। হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর স্ত্রী মরিয়মের ললাটে অসাধারণ এক উজ্জ্বলতা লক্ষ করে বুঝতে পারলেন এ মেয়ে কোনো সাধারণ মেয়ে নয়। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট কোনো এক মহান ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে আছে তাঁর মধ্যে। ভবিষ্যতে এর সন্তানদের মধ্যে হয়ত কাউকে আল্লাহতায়ালা মহামানবের মর্যাদা দান করবেন। তাই তিনি মরিয়মকে যথেষ্ট আদর করতেন এবং প্রাণপণ সেবা-যত্ন করতেন।

প্রথম জীবনে মরিয়ম অধিকাংশ সময় খালার কাছে কাটাতেন। পরে অধিকাংশ সময় মসজিদে তাঁর নির্দিষ্ট হুজরা বা কক্ষে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। হযরত জাকারিয়া (আঃ) বাইরে থেকে কক্ষের বা হুজরার তালা বন্ধ করে রাখতেন। এক দিন হযরত জাকারিয়া (আঃ) মরিয়মকে তালাবদ্ধ করে রেখে অন্য জায়গায় এসে এমন সমস্যায় পতিত হলেন যে, চারদিন তিনি আর হুজরায় যেতে পারেননি তিনি এক রকম ভুলে গিয়েছিলেন। চারদিন পর হঠাৎ যখন মরিয়মের কথা তার মনে পড়ল, তখন তিনি আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। চারদিন যাবৎ তিনি মরিয়মের খানা-পিনা বা খোঁজখবর নিতে পারেননি। এর মধ্যে তাঁর অদৃষ্টে না জানি কী দুর্দশা ঘটে গেছে। এই চিন্তায় তিনি পাগলের মতো দৌড়ে এসে কক্ষের তালা খুলে দেখলেন মরিয়ম নামাজে দণ্ডায়মান আছেন। তার চারপাশে নানা রকম ফলমূল ও খাদ্যের সমারোহ। তখন তিনি পাঠ করলেন 'আলহামদুলিল্লাহ'। মরিয়ম নামাজ শেষ করে খালুজানকে সালাম দিলেন। হযরত জাকারিয়া (আঃ) দুঃখিত ও লজ্জিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, মা তুমি এ কদিন কেমন ছিলে? আমি এক মহা বিপদের মধ্যে পড়ে তোমার কথা ভুলে গিয়েছিলাম, যার ফলে চারদিন তোমার খবর নিতে পারিনি। তুমি এজন্য আমাকে ক্ষমা করো। হযরত মরিয়ম (আঃ) বললেন, খালুজান আপনি কী বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না? আপনি ভোরবেলা এসব খাদ্য আমাকে দিয়ে গেলেন। এখন দুপুর না হতেই আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন আমি এ কদিন কেমন ছিলাম! কদিন আপনি কোথায় গেলেন? আপনি তো নিয়মিত দৈনিক দুবার আমার খোঁজখবর নিয়েছেন এবং আমার খাদ্য এখানে পৌঁছে দিচ্ছেন। তবে গতদিনে খাদ্য সম্ভার ছিল একটু ব্যতিক্রম। এতো রকমারি খাদ্য আপনি আর কোনো দিন নিয়ে আসেননি, যার দশ ভাগের এক ভাগও আমি সারাদিন খেতে পারি-নি। এখন আপনার কথার প্রকৃত অর্থ আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

হযরত জাকারিয়া (আঃ) তখন আল্লাহতায়ালার কুদরতি লীলার নিদর্শন উপলব্ধি করলেন এবং বললেন, মা তুমি যা বলেছ সবই সত্য; কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহতায়ালার এক রহস্যময় কীর্তি ও নিদর্শনের বিকাশ ঘটেছে। আমি চারদিন আগে তোমাকে তালাবদ্ধ অবস্থায় রেখে যাওয়ার পরে এক বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। যে কারণে তোমার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাই। চারদিন পর যখন তোমার কথা আমার স্মরণ হয় তখন আমি পাগলের মতো এখানে ছুটে এসে তোমার সামনে বিভিন্ন রকম খাবার সজ্জিত এবং তোমাকে নামাজে দণ্ডায়মান দেখে আমি কিছুটা শান্ত হই। আরও অবাক হই বিগত চারদিন যাবৎ আমি তোমার খবর নিতে পারিনি। আল্লাহতায়ালা তোমাকে তা আদৌ আঁচ করতে দেননি। তিনি ফেরেশতাদের দিয়ে তোমার খোঁজখবর নিয়েছেন। এটি ছিল আল্লাহতায়ালার এক অপূর্ব রহমতের নিদর্শন। মা তুমি নিয়মিত আল্লাহতায়ালার বন্দেগি করে যাও। তোমার অদৃষ্টে আল্লাহতায়ালা হয়তো আরও অনেক নেয়ামত রেখেছেন, যা তুমি পর্যায়ক্রমে লাভ করতে সক্ষম হবে। পরবর্তীতে দেখা গেল, আল্লাহ পাকের অপার

লীলায় সেই হুজরায় মরিয়মের গর্ভে হযরত ঈশা (আঃ) এলেন।

মান্নত করে জাহাজের যাত্রীদের জীবন বাঁচল

একদিন এক বৃদ্ধা এসে হযরত দাউদ (আঃ)-এর কাছে নালিশ করলেন, হে আল্লাহর নবী! বাজার থেকে আমি কিছু আটা নিয়ে আসার পথে হঠাৎ বাতাস আমার আটাগুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়। এখন আমি খালি হাতে বাড়ি গিয়ে মেহমান ও ছেলে-মেয়েদের কী খাওয়াবো? অতএব, আপনি বাতাসের এই অপরাধের বিচার করুন। দাউদ নবী বললেন, মা বাতাসের বিচার কীভাবে করবো? বাতাস আমার অধীনে নয়। অতএব, তার পরিবর্তে কিছু আটা দিচ্ছি, তুমি আটা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। বুড়ি মা আটা নিয়ে যখন বাড়িতে রওনা দিলেন। পথের মধ্যে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, হে বুড়ি খলিফার কাছে ভিক্ষা নিতে এসেছিলে? বৃদ্ধা বললেন না বাবা, আমি এসেছিলাম বাতাসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার উদ্দেশ্যে। হযরত সোলায়মান (আঃ) বিস্তারিত শুনে বললেন, তুমি খলিফার নিকটে পুনরায় যাও এবং বল আমি আপনার নিকট এসেছি বিচার প্রার্থী হয়ে, ভিক্ষা নিতে আসিনি।

বৃদ্ধা পুনরায় দাউদ (আঃ)-এর কাছে গিয়ে আটা ফেরত দিলেন এবং অভিযোগ পেশ করলেন। তখন দাউদ (আঃ) বুড়িকে রাজি করিয়ে দশ মণ আটা দিলেন। বুড়ি মা আটার বস্তা বহনকারীদের নিয়ে যখন পূর্বের স্থানে পৌঁছলেন, তখন সোলায়মান (আঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কী হে বৃদ্ধা! তোমার অভিযোগের বিচার পেয়েছ, না ভিক্ষা বাড়িয়ে নিয়েছ? তখন বৃদ্ধা খলিফার ব্যবহারের কথা বললেন। তখন হযরত সোলায়মান বললেন, তুমি আরও অনেক কিছু পাবে। এর জন্য তুমি পুনরায় খলিফার নিকট গিয়ে বাতাসের বিচারের প্রার্থী হও। ভিক্ষা নিয়ে বিদায় হইও না, বৃদ্ধা দেখল খলিফার নিকট গেলেই তার সম্পদ বৃদ্ধি পায়। অতএব, শাহজাদার মতো এক বিরাট ব্যক্তিত্বের কথায় তিনি আবার যাবে। তাতে তার ভয়ের কোনো কারণ নেই। খলিফা রাগ করলেই তিনি শাহজাদা সোলায়মান (আঃ)-এর কথা বলে দেবেন। এই সমস্ত চিন্তা করে বৃদ্ধা পুনরায় খলিফার কাছে গিয়ে বললেন। হুজুর অভিযোগের বিচার না করে ভিক্ষা বাড়িয়ে দিলেন। এতে আপনি কেয়ামতের দিন নিজেকে ন্যায় বিচারক বলে দাবি করতে পারবেন না। আমি সেদিন কিন্তু বলব খলিফা আমার অভিযোগের বিচার করেননি। খলিফা বৃদ্ধার কথা শুনে বললেন, তোমাকে এসব কথা কে শিখিয়ে দিয়েছে? বৃদ্ধা বললেন, শাহজাদা সোলায়মান (আঃ) আমাকে সব কিছু বলে দিয়েছেন। তখন হযরত দাউদ (আঃ) শাহজাদা সোলায়মানকে দরবারে ডাকলেন। হযরত দাউদ (আঃ) হযরত সোলায়মান (আঃ)কে বললেন, তুমি বারবার বৃদ্ধাকে আমার কাছে পাঠিয়ে আমাকে হয়রান করে তুলছ কেন? বাতাস কি আমার অধীন যে, আমি তাকে এনে বৃদ্ধার সামনে বিচার করব? এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। অতএব এ বিষয়ে বৃদ্ধাকে তুমি বারবার কেন পাঠাচ্ছো? হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহর কাছে বাতাস হাজির করার জন্য দোয়া করার কথা বললেন, হযরত দাউদ (আঃ) সোলায়মানকে সঙ্গে নিয়ে হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাতাস এসে আকৃতি নিয়ে হাজির হয়ে গেল। তখন দাউদ (আঃ) বাতাসকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ বৃদ্ধার আটা কেন উড়িয়ে নিয়েছ? বাতাস উত্তর দিল, হে আল্লাহর খলিফা বৃদ্ধা যখন আটা নিয়ে বাসায় ফিরছিল, তখন গভীর সমুদ্রে একটি জাহাজের তলদেশ ছিদ্র হয়ে যাত্রীরা ও বহু মূল্যবান মালামাল তলিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় যাত্রীরা মান্নত করে, যদি তাদের জাহাজ বিপদ থেকে রক্ষা পায়, তাহলে তারা জাহাজের সব মালামাল গরিব দুঃখীদের দান করে দেবে। আল্লাহ দোয়া কবুল করেন। জাহাজ উদ্ধারের নিমিত্তে আমাকে নির্দেশ প্রদান করেন। আমি তখন বৃদ্ধার আটা উড়িয়ে নিয়ে সে জাহাজের তলদেশের ছিদ্র বন্ধ করে দেই। ফলে জাহাজ ও যাত্রীরা মৃত্যু থেকে রক্ষা

পায়। হযরত দাউদ (আঃ) বাতাসকে জিজ্ঞেস করলেন, জাহাজটি এখন কোথায়? বাতাস বলল, এইমাত্র এই শহরের প্রান্তে সমুদ্র তীরে নোঙর করেছে। তখন তিনি বললেন, তুমি তাহলে যেতে পার, আমি জাহাজের খবর নিচ্ছি। দাউদ (আঃ) জাহাজের যাত্রী ও নাবিকদের ডাকলেন, তারা উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, জাহাজের মালামাল গরিব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করার অঙ্গীকার করেছ। তাই বৃদ্ধাকে মালামালের অর্ধেক দিয়া দিবে। বাকি অর্ধেক গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করবে। জাহাজের নাবিক ও যাত্রীরা খলিফার আদেশ শিরোধার্য করে নিল। বৃদ্ধাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল এবং জাহাজের সমুদয় মালামাল খালাশ করে সঠিকভাবে বণ্টন করে অর্ধেক বৃদ্ধাকে দিয়ে দিল। বাকি অর্ধেক গরিব দুঃখীদের দান করল। এই ঘটনা থেকে জানা গেল, জাহাজের যাত্রীরা এই মহা বিপদ থেকে বাঁচার জন্য মান্নত করল এবং জীবন রক্ষা পেল। পবিত্র কোরআনে এ ঘটনা জানা গেল।

কোরআনের এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণ হলো যে, মান্নতের উছিলায় আল্লাহতায়ালা মানুষের বিপদমুক্ত করেন, হায়াৎ বৃদ্ধি করেন, বালামছিবত দূর করেন, রিজিক বৃদ্ধি করেন, মান-সম্মান বাড়ান। কাজেই হে সম্মানিত পাঠকগণ! আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন যে, কোরআন, হাদিস মতে ছদকা বা মান্নত বিলকুল জায়েজ আছে। তাই দেখা যায় যে, কামেল পীর-মুর্শিদের দরবারে মানুষ আল্লাহর রাস্তায় ছদকা বা মান্নত হিসেবে উট, দুম্বা, মহিষ, ভেড়া, বকরি, মুরগি, চাউল, ডাল, টাকা-পয়সা ইত্যাদি দান করেন।

এ সমস্ত মান্নত যখন আল্লাহতায়ালা কবুল করেন, তখন মানুষ এই ছদকা-মান্নত কামেল পীর-মুর্শিদের দরবারে নিয়ে হাজির হন এবং ছদকা-মান্নতগুলো কামেল পীর-মুর্শিদগণ মানবের সেবায় বিতরণ করেন।

শালিনতার ভিতরেই আধুনিকতা

পবিত্র কোরআনের সূরা নূর, আয়াত ৩০-৩১ আল্লাহতা'লা বলেন, ক্বু ল্ লিল্মু'মিনীনা ইয়াগুদ্দূ মিন্ আব্ছোয়া-রিহিম্ অইয়াহ্ফাজূ ফুরূজ্বাহুম্ যা-লিকা আয্কা-লাহুম্ ইন্নাল্লা-হা খবীরুম্ বিমা-ইয়াছ্না্উ'ন্। অক্বু ল্ লিল্মু'মিনা-তি ইয়াগ্দু দ্না মিন্ আব্ছোয়া-রিহিন্না অইয়াহ্ফাজ্না ফুরূজ্বাহুন্না অলা-ইয়ুব্দীনা যীনাতাহুন্না ইল্লা-মা-জোয়াহার মিন্হা-অল্ইয়াদ্বরিব্না বিখুমুরিহিন্না 'আলা-জু ইয়ূবিহিন্না অলা-ইয়ুব্দীনা যীনাতাহুন্না ইল্লা-লিবু'উলাতিহিন্না আও আ-বা-য়ি হিন্না আও আ-বা-য়ি বু'উলাতিহিন্না আও আব্না-য়িহিন্না আও আব্না-য়ি বু'উ লাতিহিন্না আও ইখ্ওয়া-নিহিন্না আও বানী ইখ্ওয়ানিহিন্না আও বানী আখাওয়া তিহিন্না আও নিসা-য়িহিন্না আও মা-মালাকাত্ আইমা-নুহুন্না আওয়িত্তা-বি'ঈনা গইরি উলিল্ ইর্বাতি মিনার্ রিজ্বা-লি আওয়িত্ত্বিফ্লি ল্লাযীনা লাম্ ইয়াজ্ হারু'আলা-'আওর-তিন নিসা-য়ি অলা-ইয়াদ্বরিব্না বিআর্জু লিহিন্না লিইয়ু'লামা মা-ইয়ুখ্ফীনা মিন্ যীনাতিহিন্না; অতূবূ ইলা ল্লা-হি জ্বামী'আন্ আইইয়ুহাল্ মু'মিনূনা লা'আল্লাকুম্ তুফ্লিহূন্।

অর্থ: মুসলমান পুরুষদেরকে নির্দেশ দিন যেন তারা নিজেদের দৃষ্টিসমূহকে কিছুটা নিচু রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানগুলোর হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য খুবই পবিত্র। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট তাদের কার্যাদির খবর রয়েছে এবং মুসলমান নারীদেরকে নির্দেশ দিন তারা যেন, নিজেদের দৃষ্টিগুলোকে কিছুটা নিচু রাখে এবং নিজেদের সতীত্বকে হেফাযত করে। আর নিজেদের সাজ-সজ্জাকে প্রদর্শন না করে। কিন্তু যতটুকু স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পায় এবং মাথার কাপড় যেন, আপন গ্রীবা ও বক্ষদেশের প্রতি ঝুলানো থাকে। আর আপন সাজ-সজ্জাকে যেন প্রকাশ না করে। কিন্তু নিজেদের স্বামীর নিকট অথবা আপন পিতা অথবা স্বামীর পিতা অথবা আপন পুত্রগণ অথবা স্বামীর পুত্রগণ অথবা আপন ভাগিনাগণ অথবা স্বধর্মীয় নারীগণ অথবা নিজেদের হাতের মালিকানাধীন দাসীগণ অথবা চাকরের নিকট এ শর্তে যে, তারা যৌন শক্তিসম্পন্ন পুরুষ হবে না। অথবা ওই সব বালক (এর নিকট) যারা নারীদের লজ্জার বস্তুগুলোর সম্বন্ধে অবগত নয় এবং যেন মাটির উপর সজোরে পদক্ষেপণ না করে, যাতে জানা যায় তাদের গোপন সাজ-সজ্জা এবং আল্লাহ্র দিকে তাওবা করো, হে মুসলমানগণ! তোমরা সকলেই, এ আশায় যে, তোমরা সফলতা অর্জন করবে।

পবিত্র কোরআনে সূরা নূর, আয়াত-৬০ আল্লাহ পাক আরোও বলেছেন- অল্ ক্বওয়া-'ইদু মিনান্নিসা-য়িল্ লা-তী লা-ইয়ার্ জু না নিকা-হান্ ফালাইসা 'আলাইহিন্না জু না-হুন্ আইঁ ইয়াদ্বোয়া'না ছিয়া-বা হুন্না গইর মুতাবার্রিজ্বা-তিম্ বিযীনাহ্; অআইঁ ইয়াস্তা'ফিফ্না খইরুল্লাহুন্; অল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম্।

অর্থ: যারা বৃদ্ধা ঘরে অবস্থানকারী নারীগণ, যাদের বিবাহের আশা নেই, তাদের উপর কোন পাপ নেই, তাদের বহিরাবরণ খুলে রাখলে তখন যেন সাজ-সজ্জা প্রদর্শন না করে এবং তা থেকেও বিরত থাকা তাদের জন্য আরো অধিক উত্তম; এবং আল্লাহ্ শুনেন, জানেন। পবিত্র কোরআনে সূরা আহ্যাব্, আয়াত-৩৩ এখানে আল্লাহ পাক বলেছেন- অক্বর্না ফী বুইয়ূতিকুন্না অলা-তাবার্রজ্ব না তাবার্রুজ্বাল্ জ্বা-হিলিয়্যাতিল্ উলা,

অর্থ: নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান করো এবং বে-পর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলিয়াতের যুগের পর্দাহীনতা।

পূর্ববর্তী জাহেলিয়াতের মাধ্যমে প্রাক-ইসলামী যুগ বুঝানো হয়েছে। ওই যুগে নারীরা স্বগর্বে ঘর থেকে বের হতো, নিজের শোভা ও সৌন্দর্যের বাহার দেখাতো, যাতে পর-পুরুষেরা তাদের দিকে তাকায়। পোশাক-পরিচ্ছদ এমনভাবে পড়তো যে, শরীর

ভালোভাবে ঢাকতো না।
বর্তমান পৃথিবীতে পূর্বের জাহেলিয়াতি যুগের মতো-ই জলে-স্থলে, আকাশে, বাতাসে বিপদ-আপদ গজব-আজাবের কবলে দিনকে দিন মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দিকভ্রান্ত নাবিকের মত প্রতি মুহূর্তেই দিশেহারা হয়ে পড়ছে, মানুষ তার অশান্ত মনের লাগাম কষে ধরে রাখার উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। উক্ত আজাব-গজব থেকে বাঁচতে হলে, সমস্ত নারী-পুরুষের প্রতি আমার আহ্বান, আপনারা আপনাদের ঈমান-আকিদা, আখলাক-চরিত্র ঠিক রাখার জন্য নিজেদের দৃষ্টি ও পোশাকের শালিনতা রক্ষা করে চলার চেষ্টা করুন। বর্তমানে মিডিয়ার কারণে সারাপৃথিবী হাতের মুঠোয়, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট অথবা টিভির রিমোটকন্ট্রোল চাপলেই এক দেশে থেকে অন্য দেশের খবরা-খবর সহজেই জানা যায়। দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখা যায় এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির দেখা মেলে। কিন্তু এর ভিতরে রয়েছে অনেক দেশের উগ্র সংস্কৃতি, যা ইসলামের দৃষ্টিতে পুরোপুরি নিষেধ। কিন্তু বিশ্ব সংস্কৃতির রঙ্গিন পর্দা মানুষের চোখের সামনে উন্মুক্ত, সেখানের পোশাক-পরিচ্ছদে থাকে উগ্র মনোভাবের আকর্ষণ। এই আকর্ষণের মোহ নারী-পুরুষ, ছোট বড় সবাইকেই আক্রন্ত করতে পারে। আর এতে আক্রন্ত হয়ে পড়লে মানুষের সুস্থ ও সুন্দর মানসিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে কঠিন বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। মিডিয়ার কল্যাণে পৃথিবীর অনেক অদেখা স্থানে না গিয়েও দেখা যায় এ কথা ঠিক। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, এই দেখা এবং জানার মধ্যে কতটুকু সামাজিকতা, ভদ্রতা বা শালিনতা রক্ষা পাচ্ছে? এর প্রভাবে সমাজের অগ্রগতির পাশাপাশি কোন ক্ষতি হচ্ছে কি না? এর মাধ্যমে কোনো রকম আত্মিক উন্নতি হচ্ছে কি না? এই বিষয়গুলোও মনে রাখা দরকার।
বিজ্ঞানের প্রযুক্তি বাদ দিয়েও চলা যাবে না। মানুষের জীবন যাত্রার গতি, বুদ্ধির বিকাশ এবং প্রয়োগের ক্ষেত্র উন্নয়ন হয়েছে এর মাধ্যমে। কিন্তু মানুষের কল্যাণে বিজ্ঞানের যে ব্যবহার, তার চেয়ে অকল্যাণের মাত্রাটাও খুব কম না। অনৈতিকতার ভারে নৈতিকতা ভুলে যেতে বসেছে মানুষ, বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন উপায়ে আধুনিকতার নামে চলছে নগ্নতা, যে কারণে সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে লজ্জা-শরম ও মানবিক মূল্যবোধ। একে অন্যের প্রতি আদব-কায়দা, মায়া-মহব্বত, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে, যেটা কখনোওই কারো কাম্য হতে পারে না। অসংযত হয়ে পড়ছে মানুষের শুভবুদ্ধির খেয়াল-চিন্তাধারা, এ কারণে মানুষের চোখের পর্দা সরে গিয়ে সেখানে স্থান পাচ্ছে অন্যের ক্ষতি করার অসামাজিক কার্য্যকলাপ। অথচ পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ে বিশদভাবে সাবধান করা হয়েছে। আল্লাহতা'লা সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দিয়ে সৃষ্টি জগত ও মানুষের কল্যাণের জন্য এই অমূল্য মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন পাঠিয়েছেন, আমাদের প্রিয় আখেরী নবী রহমাতাল্লিল আলামিনের মাধ্যমে। নবীজি (সাঃ) আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা সব জাতি, সব ধর্মের জন্যই মহা কল্যাণকর। সেখানে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এবং মাতৃত্বের মায়ার যে সম্মিলন, তার কতটুকু আমরা উপলব্ধি করতে পারছি নিজেদের জীবনে? কিংবা পবিত্র কোরআনের সঠিক শিক্ষা নিয়ে তা প্রয়োগের তাগিদ দিচ্ছি নিজেদের আত্মিক কল্যাণে? অথচ জীবনের অতি মূল্যবান সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।
অনেক আগে থেকেই ও বর্তমানে লক্ষ্য করা যায় যে, দরাকারে বা, বিনা দরকারে টিভি ডিশ চ্যানেল ও ইন্টারনেটে ডুবে থাকে ছোট, বড়, যুবক, বুড়া, নারী-পুরুষ সবাই। কারণ ওখানে নিত্য পণ্যের নতুন সমাহার, যা চাই, তা-ই পাই! কিন্তু এই চাওয়া পাওয়ার ফাঁক গলে ফুরিয়ে যাচ্ছে অমূল্য সম্পদ সময়। উবে যাচ্ছে যুব-সমাজ, মরণঘাতী নেশার কবলে মৃত্যুবরণ করছে একেকটি মূল্যবান জীবন, সর্বশান্ত হয়ে পড়ছে তাদের পরিবার এবং ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সমাজ তথা রাষ্ট্র। সেই সব পরিবারের বাবা-মা

ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখা চোখের পানি ফেলছে রাত-দিন। নাবালক শিশু-সহ নানা বয়সের নারী-পুরুষ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে, হিংসা-নিন্দা, মারামারি, কাটাকাটি, ঝগড়া-ফ্যাসাদ দাঙ্গা-হাঙ্গমা পৃথিবীতে লেগেই আছে। সবখানে শুধু আতঙ্ক আর হাহাকার, মানুষের উপর থেকে যেন শান্তি উঠে গেছে, কেউ কারো কথা শুনছে না, সবকিছুতেই কেবল দম্ভ-অহঙ্কার। এ কারণে এক মানুষের উপর থেকে আরেক মানুষের দয়া-মায়া-মমতা, মূল্যবোধ-শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং বিশ্বাস সত্যিকার অর্থে কমে গেছে এবং যাচ্ছে। এখন বিজ্ঞানের প্রযুক্তি ও মিডিয়া কি পারে না, হারিয়ে যাওয়া লজ্জা-শরম, সামাজিক মূল্যবোধ, মায়ের মমতা এবং বাবার স্নেহ-ভালোবাসা ফিরিয়ে দিতে? নিশ্চয়ই মিডিয়ার পক্ষেই সম্ভম এ ধরণের গর্হিত কার্যকলাপ থেকে আপামর মানুষদেরকে রক্ষা করার সঠিক পদ্ধতি বা উপায় বেশি বেশি প্রচার করে ভুল পথ থেকে মানুষদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে। অবশ্যই মিডিয়া একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম যেখানে রয়েছে, গণ-মানুষের সমর্থন, তথ্য এবং আনন্দ-বিনোদনের স্থান। কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, চিত্ত সুখ আর বিত্ত সুখ কখনোও এক না। মনের সুখের জন্য দরকার আল্লাহতা'লার পক্ষ থেকে রহমতের ছায়াধারা এবং বিত্ত সুখের জন্য দরকার অর্থ, আবার এই অর্থই মানুষের স্ব-ইচ্ছায় ডেকে আনে অনর্থের কঠিন জঞ্জাল। তাই সম্মানীত পাঠকগণ, অল্প সময়ের জন্য দুনিয়াবী এ সমস্ত পাপের আবর্জনা এবং আখেরে আজাবের আগুন থেকে নিজেকে, পরিবারকে, সমাজকে এবং দেশকে বাঁচতে হলে, প্রথমেই নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। কারণ, অন্তরাত্মাকে পবিত্র না করে মৃত্যু হলে, সে মৃত্যুর কোনই মূল্য নেই। আত্মার এই পরিশুদ্ধতা অর্জন করা একা একা কখনোই সম্ভব না, এর জন্য প্রতিটি মানুষকেই তার (যুগে) সময়ে একজন কামেল পীর-মুর্শিদের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করতে হয়। কারণ, মহান আল্লাহর অলি-বন্ধু হিসেবে একমাত্র তিনি-ই পারেন, অন্ধকার নষ্ট আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা এবং আঁধার মুছে ইহকাল ও পরকালের পথকে আলোকিত করার শিক্ষা দিতে। পৃথিবীতে দেশ-জাতীয়তা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে, ভাষা-রীতি-নীতি বা সংস্কৃতি আলাদা আলাদা হতে পারে, কিন্তু উগ্রতা বা নগ্নতার বাহার কোনো ব্যক্তি বা দেশ-কালের জন্যই আধুনিকতা হতে পারে না। কারণ, এতে মানুষের মন-সহ কোন কিছুর জন্যেই সুফল বয়ে আনে না। তাই মুসলমানদের অবশ্যই কর্তব্য এ সমস্ত গর্হিত কার্য্যকলাপ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখে, পবিত্রতার সঙ্গে ঈমানকে রক্ষা করা এবং আল্লাহর ডাকে শক্ত ঈমান নিয়ে পরপারে যাওয়ার জন্যে সব সময় প্রস্তুত থাকা।

কামেল পীর-মুর্শিদকে বাবা বলার অকাট্য দলিল

বাবা শব্দের অর্থ হলো জনক, পিতার মত আশ্রয়স্থল, পুত্র বা পুত্র সমতুল্য (পুত্র স্থানীয়কে আদরে ও স্নেহ সম্বোধনে) ব্যবহৃত শব্দ, কামেল পীর-মুর্শিদ, সুফি, সাধু-সন্ন্যসী এবং দেবতার প্রতি সম্মান সূচক উপাধি, বাবাজান অধিকতর শক্তিশালী সম্ভ্রমপূর্ণ উক্তি, এছাড়াও আঞ্চলিক ভাষাগত পার্থক্যের কারণে বিভিন্নভাবে বলা হয় যেমন, বাবুজী, বাবাজী, আব্বা, আব্বাজান, আব্বাহুজুর ইত্যাদি বলা হয়। বাবা বলা যায় এমন শব্দগুলো হচ্ছে ধর্ম জীবনের উপদেষ্টা, সাধক পন্থার নির্দেশক, শিক্ষক বা ওস্তাদ, সম্মানে বা বয়সে মুরব্বী, মাননীয় ব্যক্তি, দায়িত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তি, মহান ব্যক্তি এবং গুরুর তুল্য মান্য ব্যক্তিকে বাবা বলা হয়।

আভিধানিক অর্থে :

A male who sires (and often raises) a child.
A male donator of sperm which resulted in conception.
A term of address for an elderly man.
A person who plays the role of a father in same way.
The founder of a discipline.

পবিত্র কোরআন শরীফে সূরা হাজ্জ ৭৮ নং আয়াতে আল্লাহতা'আলা বলেন, অ জ্বা-হিদূ ফিল্লা-হি হাক্ব ক্ব জ্বিহা-দিহ্; হুওয়াজ্ব তাবা-কুম্ অমা-জ্বা'আলা আলাইকুম্ ফিদ্দীনি মিন্ হারজ্ব; মিল্লাতা আবীকুম্ ইব্র-হীম; হুওয়া ছাম্মা-কুম্ মুল্ মুস্লিমীনা মিন্ ক্ববলু অফী হাযা-লিয়াকূনার্ রসূলু শাহীদান্ 'আলাইকুম্ অ তাকূনূ শুহাদা-য়া 'আলান্ না-সি ফাআক্বীমুছ্ ছলা-তা অ আ-তুয যাকা-তা ওয়া'তাছিমূ বিল্লা-হ্; হুওয়া মাওলা-কুম্ ফানি'মাল্ মাওলা-অনি'মান্নাছীর্।

অর্থ: তোমরা আল্লাহর জন্য শ্রম স্বীকার কর, যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলির জন্যে। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

সূরা আহযাবে, পারা ২২ আয়াত ৬ আল্লাহতা'আলা আরও বলেন, আন্নাবিয়্যু আওলা বিল্মু'মিনীনা মিন্ আন্ফুসিহিম্ অআয্ওয়া-জ্বুহু উম্মাহা-তুহুম্ ।

অর্থ: নবী (সাঃ) মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।

দেখা যায় যে মানুষ সৃষ্টি এবং জন্মের শুরু থেকে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক জন্ম-সুতায় গাঁথা। পারিবারিক জীবনে জন্মদাতা বাবা তার ছেলেকে আদর করে বাবা বলে ডাকেন। আবার ছেলেও বাবাকে, বাবা বলে ডাকেন। তাহলে, এখানে কে কার বাবা? এর মধ্যে পার্থক্য কী? বুঝতে হবে, কাউকে কোনো সম্বোধন বা কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক শুধু রক্ত সম্পর্কের মাধ্যমেই হয় না। ছেলে-মেয়ের বিয়ে-শাদীর সময় উভয় পক্ষ থেকে একজন উকিল থাকেন, যার মাধ্যমে বিয়ের শুভকাজ সম্পন্ন করা হয়, তাকে আমরা উকিল বাবা ডাকি। আবার শ্বশুরকে বাবা বলি। ছোট ছেলে-মেয়েকে আদর করে বাবা বলি। পথে-ঘাটে চলতে-ফিরতে গিয়ে রিক্সা চালক ও অন্যান্য গাড়ি চালকসহ অনেককেই বাবা

সম্বোধন করা হয়। আবার মুরব্বিদেরকেও কেউ কেউ আদব বা সম্মানার্থে বাবা বলে সম্বোধন করি। বয়সে একটু বড় হলে তাকেও সম্মানার্থে অনেক সময় বাবা বলি। আসলে বাবা ডাকের মধ্যে আলাদা আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায়। যেমন মায়ের ক্ষেত্রেও তাই। আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)কে বাবা বলি, মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আঃ)কে বাবা বলি। এঁদের মধ্যে শুধু একজন হলেন জন্মদাতা বাবা এবং বাকিরা হলেন সম্বোধনমূলক। ফলে তরিকতের ভাষায়ও কামেল মুর্শিদ রূহানী (আত্মার) পিতা। তাই আমরা নিজ নিজ পীর-মুর্শিদকে খাজাবাবা বলে ডেকে তাঁর প্রতি ভালোবাসা-শ্রদ্ধা- সম্মান প্রদর্শন করি।

আল্লাহতায়ালা আদম সৃষ্টির আগে ফেরেশতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন

অইয্ ক্বালা রাব্বুকা লিলমালাইকাতি ইন্নী জ্বাইলুন ফিল আরদ্বি খালীফাহ্; ক্বালু আতাজয়ালু ফিহা মাই ইয়ুফসিদু ফীহা অইয়াসফিকুদ দিমা-আ, ওয়া নাহনু নুসাব্বিহু বিহামদিকা অনুকাদ্দিসু লাক; ক্বালা ইন্নী আ'লামু মা-লা-তা'লামুন। (সূরা বাকারা, আয়াত - ৩০)

অর্থ : যখন আল্লাহতায়ালা ফেরেস্তাদের বললেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা বানাতে চাই, (তোমাদের মতামত কী?) তখন ফেরেস্তারা বললেন, হে দয়াময় আল্লাহতায়ালা এমন প্রতিনিধি বানালে, যিনি দুনিয়াতে গিয়ে খুনখারাবি-মারামারি হান-াহানি অশান্তি করে আপনার নামের কলঙ্ক করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। আমরা তো যথেষ্ট পরিমাণ আপনার তাসবীহ্-জিকির প্রশংসা ও পবিত্র গুণের বর্ণনা করছি। আল্লাহতায়ালা ফেরেস্তাদের সাবধান করে বললেন– হে ফেরেশতারা, নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।

'তাফসীরে মাযহারী'তে আরো বলা আছে, খলিফা অর্থ প্রতিনিধি । এই প্রতিনিধি হচ্ছেন, হযরত আদম (আঃ)। তাঁকে খলিফা হিসেবে প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে– আল্লাহতায়ালার বিধানাবলী ও বিধান অনুসারে বিষয়ের প্রচলন, পথ-প্রদর্শন, সত্যের পথে আহ্বান, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি। এতে আল্লাহতায়ালার কোন প্রয়োজন নিহিত নেই। কারণ, তিনি কারো মুখাপেক্ষি নন। কিন্তু সৃষ্টিকুল তাঁর মুখাপেক্ষি । সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষের জন্যই তিনি প্রতিনিধি পাঠানোর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ, সাধারণ মানুষ আল্লাহতায়ালার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা রহিত। সরাসরি আল্লাহতায়ালার আদেশ বা ঐশী বাণীতে পাঠানো বিধান গ্রহণ করতে তারা অক্ষম। তাই পরম দয়ালু আল্লাহ এই প্রতিনিধিত্বের পরম্পরা শুরু করার অভিপ্রায় বা ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন হযরত আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে।

কোরআন-হাদিস পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে, আল্লাহতায়ালা সৃষ্টিজগৎ ও কূলকায়েনাত পরিচালনা করার জন্য ফেরেস্তাদের মধ্য থেকে প্রধান প্রধান কিছু সংখ্যক ফেরেস্তাকে দায়িত্বভার বণ্টন করেছেন।

যেমন– জিব্রাইল (আঃ)-কে আল্লাহতায়ালা নবী-রাসুলের কাছে বার্তাবাহক হিসেবে আসা-যাওয়ার দায়িত্বভার দেন। মিকাইল (আঃ)-কে আল্লাহতায়ালা রিজিক বণ্টনের দায়িত্বভার দেন। ইসরাফিল (আঃ) সিঙ্গা নিয়ে বসে আছেন আল্লাহতায়ালার হুকুমের অপেক্ষায়। আযরাইল (আঃ)-কে আল্লাহতায়ালা সকল প্রাণির জান-কবজের দায়িত্বভার দিয়েছেন। কেরামান-কাতেবীন এই দুই ফেরেস্তাকে মানুষের ভাল-মন্দ লেখার দায়িত্ব দিয়েছেন। মনকির-নকির নামের দুই ফেরেস্তাকে কবরে যারা শয়ন করেছেন, তাঁদের সওয়াল-জবাব বা প্রশ্ন করার জন্য দায়িত্বভার দিয়েছেন। বেহেশত পাহারা দেয়ার জন্য রেদওয়ান নামের এক ফেরেশতাকে দায়িত্বভার দিয়েছেন। দোজখ পাহারা দেয়ার জন্য মালেক নামের এক ফেরেস্তাকে দায়িত্বভার দিয়েছেন। আল্লাহতায়ালা ফেরেস্তাদের মধ্যে অন্যান্য আরো ফেরেস্তাদের বিভিন্ন দায়িত্বভার দিয়ে, সুনিপুনভাবে পরিচালনা করতেছেন তাঁর অপার সৃষ্টিকে।

হে সম্মানিত পাঠকগণ! গভীর চিন্তা করে দেখুন, যে আল্লাহতায়ালা 'কূন-ফাইন্না-কুন'-এর মালিক। তিনি আদম সৃষ্টির আগে ফেরেস্তাদের সঙ্গে পরামর্শ নিলেন কেন? তিনি ইচ্ছা করলেই তো তাঁদের মতামত ছাড়া আদম সৃষ্টি করতে পারতেন। কাজেই

আল্লাহতায়ালা সবকিছুর জন্য মাধ্যম তৈরি করে দিয়েছেন। তাই আল্লাহতায়ালা প্রকাশ-বিকাশ হওয়ার জন্য, আদম সৃষ্টির পর যুগে যুগে নবী রাসুলদের পাঠিয়েছেন। যেহেতু এখন নবী রাসুলদের দরজা বন্ধ, তাই এখন হলো বেলায়েতে মাশায়েখদের যুগ। তাঁরাই পথহারা মানুষদের জন্য পথের দিশারী, যাঁরা নায়েবে নবী জমানার কামেল পীর-মুর্শিদ এবং তাঁরা-ই হলেন আল্লাহতায়ালাকে পাওয়ার সঠিক মাধ্যম।

প্রিয় পাঠক, তাহলে চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহকে পাওয়ার রাস্তায় কোনো আধ্যাত্মিক গুরু বা পীর-মুর্শিদ ধরার প্রয়োজন আছে কি না?

লাইলাতুল বরাতের গুরুত্ব
(Importance of Lailatul Barat)

সূরা আদ দোখান, ৩ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'ইন্না আন্যালনা হু ফী লাইলাতিম মুবারাকাতিন্ ইন্না কুন্না মুন্যিরীন'। অর্থ: নিশ্চয়ই আমি এটি এক মঙ্গলময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি, নিশ্চয় আমিই সতর্ককারী'।

সুতরাং লাইলাতুল বরাতের ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে– এটাই আমার পরীক্ষিত অভিমত।

হাদিস: ক্বালান নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইজা কানাত লাইলাতুন নিসফি মিন শা-বানা। ফা-ক্বু-মু লাইলাহা ওয়া সু-মু-ইয়াও মাহা ফাইন্নাল্লাহা তাআলা ইয়ানজিলু ফি-হা লিগুরু বিশ শামসি ইলাস সামা ইদদুনিয়া ফায়াক্বুলু আলামান মুসতাগফিরুন ফাগফিরলাহু। আলা-মান মুসতারজিক্বুন ফাআর জুক্বহু, আলা মান মুবতালিয়ান ফাউ আফিহি। আলাকাজা আলাকাজা হাত্তা ইয়াত্লু আল ফাজর (রাওয়াহুবনু মাজাহ)।

অর্থ: রাসুল (সঃ) বলেছেন, যখন শাবান মাসের ১৫ তারিখ উপস্থিত হয়, তোমরা ওই রাতে বেশি করে নফল ইবাদত করিও এবং ওই দিনে রোজা রাখিও, কেননা আল্লাহতায়ালা ওই দিন সূর্যাস্তের সময় প্রথম আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন, তোমাদের মধ্যে কে ক্ষমা প্রার্থী আছ? আমি আজ তাকে ক্ষমা করবো। তোমাদের মধ্যে কে জীবিকা প্রার্থী আছ? আমি আজ তাকে রিযিক দান করবো। তোমাদের মধ্যে বিপদগ্রস্ত কে আছ? আজ আমি তার বিপদ দূর করে দিবো। আল্লাহতায়ালা ফজর পর্যন্ত এইভাবে প্রত্যেক হাজতমন্দকে ডেকে বলে থাকেন।

হাদিস: ওয়া ক্বালা আলাইহিস সালাম, মান সামা ছালাছাতা, আইয়্যামিম মিন শা-বানা, বাআছাহুল্লাহু ইয়াউমাল ক্বিয়ামাতিন আলা না-ক্বাতিম মিন নুক্বিল্ জান্নাহ' (নাক্বালাহুব-নু নুবাতাহ)। অর্থ: হুজুর (সঃ) বলেন– 'যে ব্যক্তি শাবান মাসে ৩ টি রোজা রাখবে, আল্লাহতায়ালা তাকে বেহেশতি উটে আরোহণ করিয়ে কবর থেকে উঠাবেন' (ইবনু মাজাহ)।

আল-হাদিস: ওয়াক্বালাত আয়শাতু রাদিআল্লাহু-তা'য়ালা আন্হা মা রাআইতুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফি শাহর, আকছারা মিন্হু সিয়ামাম ফি শা-বান। (মুত্তাফাক্বুন আলাইহি)

অর্থ: হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন– 'রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে শাবান মাসের মতো অধিক নফল রোজা রাখতে আমি আর কোনো মাসে দেখিনি' (বোখারী-মুসলিম)।

এ বিষয়ে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, তাঁর লেখা বেহেশতি জেওর: তৃতীয় খণ্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা থেকে, শবেবরাত পালন করার গুরুত্ব উল্লেখ রহিয়াছে। হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে, (চৌদ্দ দিবাগত) পনেরই রাতে সারা-বছরের হায়াৎ-মউত, রিযিক ও দৌলত লেখা হয়। ওই রাতে বান্দাগণের আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। হুজুর (সঃ) স্বীয় উম্মতগণকে বলিয়াছেন– 'শাবানের ১৫ তারিখ রাতে জাগিয়া তোমরা আল্লাহর এবাদত করিও এবং দিনের বেলায় রোজা রাখিও। কেননা ওই রাতে বান্দাগণের প্রতি আল্লাহর খাস্ রহমতের দৃষ্টি নিপতিত হয়। এমনকি ওই রাতের সন্ধ্যা হইতে ছোবহে্ সাদিক পর্যন্ত দুনিয়ার আকাশ হইতে, আল্লাহর বাণী দুনিয়াবাসীর জন্য ঘোষিত হইতে থাকে যে, হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে যাহার গুনাহ্ মাফের দরকার থাকে মাফ চাহিয়া লও, আমি মাফ করিবার জন্য প্রস্তুত। তোমাদের মধ্যে যাহ-ারা রিযিকপ্রার্থী আছ রিযিক চাহিয়া লও, আমি দিবার জন্য প্রস্তুত।

তোমাদের মধ্যে যাহারা রোগ আরোগ্য করিবার এবং বিপদ হইতে মুক্তি চাহিবার প্রয়োজন আছে চাহিয়া লও, আমি উহা দিবার জন্য প্রস্তুত। এইভাবে বান্দাদিগকের একেকটি প্রয়োজনের নাম উল্লেখ করিয়া করিয়া বলিতে থাকেন। ছোবহে্ সাদিক পর্যন্ত ঘোষণা করিতে থাকেন।

হায়! দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হইতে অনুগ্রহ লাভের এই সুবর্ণ সুযোগ থাকার পরেও, যাহ-ারা তা অবহেলায় গ্রহণ না করে, তাহাদের অপেক্ষা হতভাগ্য আর কে হইতে পারে? কোরআন ও হাদিস পর্যালোচনা করে দেখা গেল শবেবরাতের রাত, একটি গুরুত্বপূর্ণ রাত। যে রাতে মানুষের তকদিরের হরণ-পূরণ (পরিবর্তন পরিবর্ধন) হয়। তাই, হে আমার আশেকান- জাকেরান মুমিন মুসলমানগণ! আপনারা অনুগ্রহ করে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত বিছানায় পিঠ লাগাবেন না। সারারাত নফল নামাজ, জিকির-আজকার, মোরাকাবা-মোশাহাদার ভিতর দিয়া এবাদত বন্দেগীতে কাটাবেন।

মোরাকাবা কোরআন-হাদিসের দলিলে নির্ভুল প্রমাণিত

শামসুল আরেফিন কিতাবে বর্ণিত আছে, ওয়াযে রাহে কে চুপ ইসমে আল্লাহ জাত কে তাছাবুরে ও কালেমায়ে তৈয়ব কি তারতিব কে মোয়াফেকে আক বন্দ করে মোরাকাবা করতা হে। আউর ইসমে জাত কে তাছাবুর কি তলোয়ার হাত মে লিতা হে। তু আপনি উমর বহর কে সগিরা আউর কবিরা গুনাহু আউর নফছে আউর শায়তান কো কতল কারদি না আউর তামাম রুহে জামিনকে খান্নাছ কারতুম আউর তামাম খাতারাত কো কতল করদিতা হে।

(হাদিস) আত্তাফাক্কারু সা আতান খাইরুম মিন্ ইবাদাতিছ্ ছাকালাইন্

এক ঘড়ি কা তাফাক্কার হার দু জাহান কি ইবাদত ছে বড় কারহে চুঁকে আল হযরত (সোয়াদ-লাম-আইন-মিম) হামেশা মোরাকাবা। হুজুর আউর তাফাক্কুর তামাম মে রাহা কারতেথে। ইসলিয়ে ইস আয়াত

ইন্নাল হাসানাতি ইউজ হিবনাছ্ সাইয়াত

অর্থাৎ- প্রকাশ থাকে যে, যখন চোখ বন্ধ করে আল্লাহর জাতিনাম এবং কলেমায়ে তৈয়্যেবার যথারীতি মোরাকাবা করে এবং আল্লাহর জাতিনামের তলোয়ার হাতে নেয়, তখন নিজের সমস্ত জীবনের সগিরা ও কবিরা গুনাহসমূহকে, নফছকে এবং শয়তানকে বলি দিয়ে থাকে। এমন কি সমস্ত জমিনের খান্নাছ এবং তার চাতুরীকে ধ্বংস করে দেয়।

হাদিস শরিফে আছে, আত্তাফাক্কারু সা আতান খাইরুম মিন্ ইবাদাতিছ্ ছাকালাইন্

অর্থাৎ-একঘণ্টা মোরাকাবা করা দুইজাহানের এবাদতের চেয়েও উত্তম। রাসুল (সঃ) সবসময় মোরাকাবা ও আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন।

আল্লাহপাক এই আয়াতে বলেছেন– 'ইন্নাল হাসানাতি ইউজ হিবনাছ ছাইয়াত'।

অর্থাৎ-নিশ্চয়ই নেক-আমল বদ-আমলকে ধ্বংস করে দেয়। এই ধ্বংস মানুষের সৃষ্টি দেহ ও আত্মার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সুতরাং নেক-আমলের জন্য দেহ এবং আত্মার মাধ্যমে (দুই এক করে) এবাদত করা প্রয়োজন।

ইন্না ফি খালকিছ সামা ওয়াতি (আল আখের)

তফছিরে রুহোল মায়ানিতে লেখা আছে– 'আলআবদু মোরাকাবুন মিনান নাফছিল বাতিনা ওয়াল্লাজিনা জ্বাহিরু ওয়াফিল আউয়্যালি ইশারাতু ইলা উবুদিয়া আস-সানি ওয়াফিছ্-ছানি ইশারাতু ইলা উবুদিহিল আউয়্যালি লি আন্না তাফাক্কুরা ইন্নামা ইয়াকুনু বিল ক্বালবি ওয়ার রুহি।'

অর্থাৎ, আত্মা ও ভৌতিক শরীরের মাধ্যমে মানুষ তৈরি। ঐ আয়াতের প্রথম অংশ 'আল্লাজিনা ইয়াজকুরুনাল্লাহা' দ্বারা শরীরের এবাদতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং শেষ অংশ 'ওয়া ইয়াতা ফাক্কারুনা ফি খালকিছ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি' দ্বারা আত্মার এবাদতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু তাফাক্কোর করা শরীর দিয়ে হয় না, অন্তর দিয়েই হয়ে থাকে, তাই নফল এবাদতের মধ্যে মোরাকাবা উত্তম।

হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- আন আবি হুরাইরাতা ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহি সলল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিকরাতু সা আতান খাইরুম মিন্ ইবাদাতি সিত্তিনা সানাহ্

অর্থাৎ-আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল (সঃ) বলেছেন, ৬০ বছর নফল এবাদতের চেয়ে এক ঘণ্টা মোরাকাবা করা উত্তম। মোরাকাবা উত্তম হওয়ার দুইটি কারণ রয়েছে, যেমন তাফছিরে রুহোল বয়ানে সূরা আলে এমরানে আছে :

ইয়া তাফাক্কারুনা ফি খালকিছ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি (আল আখের) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে– ওয়াফিল ফাছিলি ওয়া জাহানি আহাদু হুমা ইন্নাত তাফাক্কারা ইউ সদাকু ইলাল্লাহি তায়ালা ওয়াল-ইবাদাতু তু সালাকু ইলা সাওয়া বিল্লাহি ওয়াল্লাজি সালাকু ইলাল্লা হি খাইরুম মিম্মা ইউ সালাকু ইলা গাইরিল্লাহি ওয়াস সানি আন তাফাক্কারা আমালুল ক্বালবি ওয়াত্বয়া আতি আমালুল জাওয়ারিহি ওয়াল ক্বালবু আশরাফু মিনাল জাওয়ারিহি ওয়া ফাকানা আমালুল ক্বালবি আশরাফু মিন আমালিল জাওয়ারিহি
অর্থাৎ-নফল ইবাদতের মধ্যে মোরাকাবা শ্রেষ্ঠ হওয়ার দুটি কারণ এই যে, মোরাকাবার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করা যায়। দৈহিক এবাদতের মাধ্যমে শুধু আল্লাহ-তায়ালার অনুগ্রহ লাভ হয়। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে আত্মা উত্তম। সুতরাং আত্মার কাজ মোরাকাবা করা। মোরাকাবা নফল এবাদতের চেয়ে উত্তম।
হাদিস শরীফে আছে, তাফসিরে খোলাছায় ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে– 'আয়াত ওয়া আহাদিস যাকার আউর যাকের কি মদহি ওয়া সানামে শাহিদে জাহের আউর দলিলে মুসলিম মে মাগার যিকের দাওয়াম বিদুনে ফকর মহকিন হী নেহী আউর ফকর মুনতাহা মে যিকির হে মোজাহার মে বাই হাকিসে মরবিয়ে হে। লা ইবাদাতু কা ইতাফাক্কার, ফকর কারলিয়েকে মিছাল কুই ইবাদত নেহী যিকিরকা আ'জা আউর দিলপর আসর হে আউর লিকার আহা তোয়া আকায়েদ ও রুহ পর হে। যিকির ছে গাফলত দূর হোতি হে ফকর ছে হাস্তি মিট যাতি হে, ইছলিয়ে হযরত সুফিয়ানে মরাকিয়াত কু যিকির ও মশগুল পর ফাউকিয়াত দিয়াহে, যিকিরছে আল্লাহ ইয়াদ আতাহে ফকরছে আপনি খুদি জু-বানায়ি ফাসাদ হে বহুল যাতাহে।
অর্থাৎ, জিকিরকারীর প্রশংসা কোরআন-হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে ঠিক। কিন্তু তাফাক্কোর (১) বা মোরাকাবা ছাড়া জিকিরে দাওয়াম অর্থাৎ, দিন-রাত্রি সবসময় আল্লাহ-তায়ালাকে স্মরণ রাখা সম্ভব হয় না। মোরাকাবা হলো জিকিরের শেষ দরজা।
ওই তফছীরে খোলাছায়ে মাজহারী থেকে বায়হাকী বর্ণিত হাদিসে লেখা আছে, নফল এবাদতের মধ্যে তাফাক্কোর বা মোরাকাবার মত আর কোন প্রকার এবাদতই নেই। জিকিরের ক্রিয়া শরীর ও দিলের উপর পতিত হয়। মোরাকাবার ক্রিয়া ধর্ম বিশ্বাস ও আত্মাকে মজবুত করে। জিকিরের মাধ্যমে গাফিলতি দূর হয় এবং মোরাকাবা স্বীয় অস্তিত্বকে ভুলিয়ে দেয়।
এই কারণে সুফিগণ মোরাকাবাকে ইন্দ্রিয় গঠিত এবাদতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। জিকিরের মাধ্যমে খোদাকে স্মরণ করা হয় বটে, কিন্তু মোরাকাবা নিজ নশ্বর-সত্ত্বা বা অস্তিত্বকে ভুলিয়ে দেয়। উপরের বর্ণনার মূলে বুঝা যাচ্ছে যে, যত প্রকার নফল এবাদতই হোক না কেন, বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে মোরাকাবা সম্পন্ন করলে, তা সকল প্রকার নফল এবাদত থেকে অনেক গুণে উত্তম।
টীকা ঃ- (১) চিন্তা করা অর্থাৎ মোরাকাবা করা।

পবিত্র মাহে রমজান
রহমত-বরকত ও নাজাতের মাস

শরিয়ত ও তরিকতের দৃষ্টিতে মাহে রমজানের গুরত্ব : এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারাহ্ ১৮৩-১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহতা'আলা এরশাদ করেন: ইয়া আইয়্যুহাল্লাযী-না আ-মানূ কুতিবা 'আলাইকুমুছ্ ছিয়া-মু কামা-কুতিবা 'আলাল্লাযীনা মিন্ ক্বব্লিকুম্ লা'আল্লাকুম তাত্তাকূন্। আইয়্যা-মাম্ মা'দূদা-ত; ফামান্ কা-না মিন্কুম মারীদ্বোয়ান্ আও 'আলা-সাফারিন্ ফা'ইদ্দাতুম্ মিন্ আইয়্যা-মিন্ উখর;অ'আলাল্লাযীনা ইয়ুত্বীক্বূ নাহূ ফিদ্ইয়াতুন্ ত্বোয়া'আ-মু মিস্কীন্;ফামান্ তাত্বোয়াও য়্যা'আ খইরন্ ফাহুওয়া খইরুল্লাহ্; অআন্ তাছূমূ খইরুল্লাকুম্ ইন কুন্তুম্ তা'লামূন্। শাহরু রমাদ্বোয়া-নাল্ লাযী উন্যিলা ফীহিল্ ক্বু র্আা-নু হুদাল্ লিন্না-সি অবাইয়্যিনা-তিম্ মিনাল্ হুদা-অল্ ফুরক্বা-নি ফামান্ শাহিদা মিন্কুমুশ্ শাহর ফাল্ইয়াছুম্হু অমান্ কা-না মারীদ্বোয়ান্ আও 'আলা-সাফারিন্ ফা'ইদ্দাতুম্ মিন্ আইয়্যা-মিন্ উখর; ইয়ুরীদুল্লা-হু বিকুমুল্ ইয়ুস্রা অলা-ইয়ুরীদু বিকুমুল্ 'উস্র অলিতুক্মিলুল্ 'ইদ্দাতা-অলিতুকাব্বিরুল লা-হা 'আলা-মা-হাদা-কুম্ অলা'আল্লাকুম্ তাশকুরূন্।

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার, গণনার কয়েকটি দিনের জন্য। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে, অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোযা পূরণ করে নিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিস্কীনকে খাদ্যদান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সঙ্গে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি রোযা রাখ, তবে তা তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার। রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য রোজা সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না, যাতে তোমরা গণনা পূরণ করে এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার জন্য আল্লাহতা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। ক্বালান নাব্বিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কুল্লু আমালিবনী আদামা ইউদাইফুল হাছানাতু বিয়াআস্রী আমছালীহা ইলা সাব-ই মিয়াতী দি'ফীন ক্বালাল্লাহু তা'য়ালা ইল্লাছ ছাওমু ফা-ইন্নাহু লি ওয়া আনা আজযিবিহী ইয়াদাউ শাহওয়াতাহু ওয়া তয়ামাহু মিন আজলি লিছ ছাইমি ফারহাতানি। ফারহাতুন ইনদা ফিৎরিহী ওয়া ফারহাতুন ইনদা লিক্বাই রাবিহ্। অলা খালুফু ফামিছ ছইমি আতইয়াবু ইনদাল্লাহী মির রিহীল মিসকী। ওয়াছ ছিয়ামু জুন্নাতুন। ফাইযা কানা ইয়াওমু ছাওমী আহাদী কুম ফালা ইয়ারফুছ ওয়ালা ইয়াসখাব, ফাইন সারবাহু ফাল ইয়াকুল ইন্নিম রাউন ছ-ইমুন' (রাওয়াহুম সাইখান)।

অথাৎ রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব সাতশত গুণ থেকে দশগুণ পর্যন্ত বর্ধিত করে দেওয়া হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু রোজা এর ঊর্ধে কেননা বান্দাহ আমারই সন্তুষ্টি লাভের জন্য যৌন সম্ভোগ ও খানাপিনা ছেড়ে দেয়, সুতরাং আমি এর পুরস্কার দিব। রোজাদারের দুটি আনন্দ– প্রথম: ইফতারের সময়, দ্বিতীয়: আল্লাহর সঙ্গে মোলাকাতের সময়। নিশ্চয়ই রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ

আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধের চেয়ে আদরণীয়। রোযা ঢাল স্বরূপ, তোমাদের কেহ যেন রোযার দিনে জঘন্য কাজ ও বিবাদ বিসম্বাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সঙ্গে বিবাদ করতে চায়, তবে সে যেন বলে দেয় যে, আমি রোজাদার (বুখারী, মুসলিম)।

সদকায়ে জারিয়া : মাতা-পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উপকারিতা

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের পর মুমিনবান্দা যেসব নেককাজের সওয়াব লাভ করে তা হল, ইলম; যাকে সে বিস্তার করেছে। নেকসন্তান, পবিত্র কোরআন শরীফ, মসজিদ নির্মাণ, মুসাফিরখানা তৈরি, খাল-খনন করা এবং এমন খাতে সম্পদ ব্যয় করা যে, মৃত্যুর পরও যার সওয়াব মৃত ব্যক্তির রুহে পৌঁছতে থাকে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা জান্নাতে তাঁর নেক বান্দাদের অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেন। তা দেখে বান্দা বলে, হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন! এত বড় মর্যাদা আমি কীভাবে পেলাম? আমিতো এমন কোন আমল করিনি। আল্লাহতায়ালা বলেন, তোমার সন্তানরা তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, তারই বিনিময়ে তোমাকে এই মর্যাদা দান করা হয়েছে, (মিশকাত শরীফ)।

কিয়ামতের দিন কতিপয় লোককে পাহাড় পরিমাণ নেক দান করা হবে। এ নেক দেখে তারা বিস্মিত হয়ে বলবে, এত নেক আমাদের কীভাবে দেয়া হল? উত্তরে বলা হবে, তোমাদের সন্তানদের নেক আমলের বদৌলতে এত নেক তোমাদের দান করা হয়েছে (ফার্সি কিতাব, শাওকে ওয়াতান)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, একজন মৃত ব্যক্তি কবরে এমনই অসহায় থাকে, যেমন অসহায় থাকে একজন পানিতে ডুবে যাওয়া ব্যক্তি। এই কবরবাসী সবসময় মা-বাবা, ভাই-বন্ধু ও অন্যদের দোয়া পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। কারো পক্ষ থেকে কোন দোয়া পৌঁছলে তা তার কাছে সমস্ত দুনিয়ার চেয়েও বেশি প্রিয় মনে হয়। নিশ্চয়ই পৃথিবীবাসীদের দোয়া-মোনাজাতের ফলে আল্লাহতায়ালা কবরবাসীদের পাহাড় পরিমাণ সওয়াব দান করেন। নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তিদের প্রতি জীবিতদের হাদিয়া হল– তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। (মিশকাত শরীফ)

গীবতকারীদের সম্পর্কে কোরআন হাদিসে কঠোর হুঁশিয়ারী

গীবত সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন, অইলুল্লি কুল্লি হুমাযা-তি ল্লুমাযাহ্। (সূরা হুমাযাহ্ আয়াত-১)
অর্থ: ধ্বংস ওই ব্যক্তির জন্য, যে লোক-সম্মুখে বদনামী করে এবং পৃষ্ঠ-পেছনে (অগোচরে) নিন্দা করে।
(তাফসীরে কান্‌যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান)
(টীকা ২-৮) এ আয়াতটি ওইসব কাফিরদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা সৈয়দে আলম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহাম্মদ মোজ্‌তবা সাল্লাল্লাহুতা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে বেড়াতো এবং হযরতের বিরুদ্ধের 'গীবত' করতো। যেমন-আখ্‌নাস ইবনে শুরায়ক, উমাইয়া ইবনে খালাফ এবং ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা প্রমুখ। আর এ আয়াতের হুকুম প্রত্যেক গীবতকারীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। মরতে দেবে না, যা সেই সম্পদের মোহে আত্মহারা এবং সৎকাজের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করছে না। অর্থাৎ জাহান্নামের ওই স্তরে, যেখানে আগুন হাড় ও পাঁজরগুলো চুরমার করে ফেলবে এবং কখনো ঠাণ্ডা হবে না। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, জাহান্নামের আগুনকে হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত রাখা হয়েছে, এ পর্যন্ত যে, তা লাল রং ধারণ করেছে। পুনরায় হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত রাখা হয়েছে। অবশেষে, তা সাদা হয়ে গেছে। পুনরায় হাজার বছর পর্যন্ত জ্বালানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কালো রং ধারণ করেছে। ওই কালো রং হচ্ছে অন্ধকার। (তিরমিযী শরীফ) শরীরের বহির্ভাগকেও জ্বালাবে এবং শরীরের অভ্যন্তরেও পৌঁছবে। আর অন্তরসমূহকে দগ্ধ করবে। হৃদয় এমন এক বস্তু, যা সামান্যতম তাপও সহ্য করতে পারে না।
সুতরাং যখন জাহান্নামের আগুন তার উপর চড়াও হবে এবং মৃত্যুও আসবে না, তখন কী ভয়ানক অবস্থা হবে! হৃদয়সমূহকে জ্বালানো এ কারণেই হবে যে, তা হচ্ছে কু-ধারণাস্থল- কুফর, ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ এবং কু-উদ্দেশ্যসমূহের। অর্থাৎ আগুনে নিক্ষেপ করে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। দরজাসমূহের বন্ধন অগ্নিময় লোহার স্তম্ভসমূহ দ্বারা মজবুত করে দেয়া হবে, যেন কখনো দরজা না খোলে। কোন কোন তাফসীরকারক এ অর্থও বর্ণনা করেছেন যে, দরজাগুলো বন্ধ করে অগ্নিময় স্তম্ভ দিয়ে তাদের হাত-পাগুলো বেঁধে দেয়া হবে। তাফসীরে মারেফুল কোরআনের মধ্যে সূরা হুমাযাহ্ (৩০পারা), ১ নং আয়াতে আছে, অইলুল্লি কুল্লি হুমাযা-তি ল্লুমাযাহ্। অর্থ: প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ। গীবত অর্থ: পরনিন্দা, কলঙ্ক, আহম্মকি, অত্যন্ত অপরিস্কার কর্ম, বিষ্ঠা ভক্ষণের মতো জঘন্য, কঠোর নিষেধাজ্ঞা অর্থে ব্যবহৃত শব্দ গীবত।

আভিধানিক অর্থে:

* To make spiteful standerous or defematory statement about someone.
* (informal) To attack from behind or when out of earshot.
* To speak badly of an absent individual.

পবিত্র কোরআনের সূরা হুজুরাত এর ১২ নং আয়াতে আরো উল্লেখ আছে, ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুজ্ব তানিবূ কাছীরম্ মিনাজ জোয়ান্নি ইন্না বা'দ্বোয়াজ্ব জোয়ান্নি ইছ্‌মুঁও অলা-তাজ্বাস্ সাসূ অলা-ইয়াগ্‌তাব্ বা'দ্বু কুম্

বাদ্বোয়া, আইয়ুহিব্বু আহাদুকুম আইঁ ইয়া'কুলা লাহ্মা আখীহি মাইতান্ ফাকারিহ্ তুমূহ্, অত্তাক্কুল্লা-হ্, ইন্নাল্লা-হা তাওয়্যা-বুর্ রহীম্। অর্থ: হে মু'মিনরা! বহু ধারণা থেকে দূরে থাক; কেননা, কিছু ধারণা পাপের কারণে হয়ে থাকে। আর তোমরা কারো গোপন খোঁজ করো না, একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়া পছন্দ কর? তোমরা অপছন্দই করবে। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

সূরা বনী ইসরাঈল ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, অলা-তাক্ব ফু মা-লাইসা লাকা বিহী 'ইল্ম্; ইন্নাস্ সাম্'আ অল্ বাছোয়ার অল্ ফুওয়া-দা কুল্লু উলা-য়িকা কা-না 'আনহু মাস্উলা'। অর্থ: তুমি এমন বিষয়ের অনুসরণ করো না, যে বিষয়ে তোমার জানা নেই। কর্ণ, চক্ষু ও মনসহ প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। আল্লাহতায়ালা সূরা ক্বাফ্- ১৮ নং আয়াতে আরো বলেন, মা-ইয়াল্ফিজু মিন্ ক্বওলিন্ ইল্লা-লাদাইহি রক্বীবুন্ আতীদ্। অর্থ: সে যা কিছু উচ্চারণ করে, তার নিকটতম অপেক্ষামান প্রহরী তা সংরক্ষণ করে থাকে।

গীবত সম্পর্কে হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে, আন আবি মুসা (রা:) ক্বালা কুল্তু ইয়া রাসুলাল্লাহ আইয়্যুল মুসলেমীনা আফজালু? ক্বালা মান ছালেমান মুসলেমুনা মিন লেছানিহী ওয়া ইয়াদিহী (মুত্তাফাকুন আলাইহ্)

অর্থ: হযরত আবু মুসা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ মুসলমানদের মধ্যে কে সর্বোত্তম? তিনি বললেন, যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদিস শরীফে আরো উল্লেখ আছে, আল্ গীবাতুআসাদ্দু মিনাজ জিনা। অর্থ: গীবত ও পরনিন্দা জেনার চেয়েও মারাত্মক পাপ। বর্তমান সমাজে দেখা যাচ্ছে যে, এক শ্রেণির মসজিদের ইমাম, আলেম, হাফেজ-ক্বারী ও উম্মি লোকেরা মসজিদ, হাট-বাজার, দোকান-পাট এবং বিভিন্ন স্থানে বসে দেশ-রাষ্ট্র, অলি-আল্লাহ, হক্কানী পীর-মাশায়েখগণ এবং অন্যান্য মানুষের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও গীবত করতেও দ্বিধাবোধ করে না। কোরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে এমন লোকদের পিছনে, সরল প্রাণ মুসলমানদের নামাজের একতাদা করা ঠিক হবে কিনা? পাঠকগণ চিন্তা করে দেখুন। যেহেতু হাদিস শরীফে আসছে– 'আল্ গীবাতু আশাদ্দু মিনায যিনা'। অর্থ: গীবত ও পরনিন্দা জেনার চেয়ে অতি গুনাহ্। তাই, এই লোকদের অনুরোধ করি, দয়া করে আপনারা গীবতের মত এই পাপ থেকে নিজেরাও বাঁচেন এবং অন্যদেরকেও বাঁচান। তাই কামেল পীর-মুর্শিদের কাছে গিয়ে আত্মশুদ্ধি, দিলজিন্দা এবং নামাজে হুজুরি করার চেষ্টা তদবির করেন। তাতে নিজের, সমাজের সর্বোপরি রাষ্ট্রের মঙ্গল হবে।

আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাদের নিয়ে নিজেই নবীজির প্রতি দরূদ-সালামের মজলিশ করেছেন

ইন্নাল্লা-হা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসল্লুনা আলান নাবীয়্যি; ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আ-মানু সল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমূ তাস্‌লিমা (সূরা আহযাব, আয়াত, ৫৬)

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর (সঃ) মহব্বতে ও সম্মানে দরূদ-সালামের মজলিশ করছেন এবং অব্যাহতভাবে করতে থাকবেন; হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর (সঃ) সম্মানে ও মহব্বতে আদবের সঙ্গে দরূদ ও সালামের মজলিশ কর।

কোরআনুল করীমের উপরোক্ত আয়াতটি আরবী ব্যাকরণিক (মুযারি'সিগা) মর্ম অনুযায়ী বর্তমান ও ভবিষ্যতের অর্থ বহন করে। আয়াতটি বহুবচনাত্মক এবং দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে মহান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর ফেরেশতাগণ; অন্যভাগে ঈমানদার মুসলমানগণ। আয়াতটিতে নবী করীমের (সঃ) মহব্বত ও সম্মানে দরূদ ও সালামের আদেশ করা হয়েছে। কিন্তু দরূদ ও সালামের এ আদেশটি কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে? তা বলা হয়নি। তবে বিষয়বস্তু বহুবচনাত্মক এবং ঈমানদারদের অর্থাৎ একাধিক ব্যক্তিকে দরূদ-সালাম অনুশীলনের আদেশ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এটি সম্মিলিত অনুশীলন প্রক্রিয়া।

জানা যায় যে, মহান আল্লাহতায়ালার উপরোক্ত আয়াতে করীমকে এর মর্ম অনুযায়ী আউলিয়াকিরামগণ দরূদ ও সালামের এ সম্মিলিত অনুশীলনটি 'ক্বিয়ামে মিলাদ শরীফ' এর মাধ্যমে অনুশীলন করতেন। তাঁরা তাঁদের অনুসারীদেরকেও অনুরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, দিচ্ছেন এবং দিতে থাকবেন। ক্বিয়ামে মিলাদ শরীফে আউলিয়াগণ প্রথমে আল্লাহতায়ালার জিকির এবং নবী করীমের (সঃ) মহব্বতে ও সম্মানে তাযীমের সঙ্গে দরূদ শরীফ পাঠ করেন। এরপর নবী করীমের (সঃ) মহব্বতে ও সম্মানে ক্বিয়ামের মাধ্যমে সালাতুস সালাম পাঠ করেন। তারপর নবীজির উছিলায় নিজেদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া-মোনাজাত করেন।

সালাম একটি প্রশংসাসূচক আশীর্বাদ জ্ঞাপক বাক্য। সালামের শাব্দিক ভাবের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য ও অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়। সালামের মধ্যে দোয়া, প্রশংসা, প্রার্থনা, শ্রদ্ধা-সম্মান, স্নেহ, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার অর্থ নিহিত আছে। সালামের জবাব দেওয়া যেমন ওয়াজিব , তেমনি আদব ও সম্মানের সঙ্গে সালাম দেওয়াও সুন্নত। আম্বিয়া, আউলিয়া ও মাতা-পিতার প্রতি আদব বা সম্মান প্রদর্শন করাও ওয়াজিব। ছোটদের সালাম ও তার জবাব দানের অর্থ হচ্ছে, দোয়া, প্রশংসা, স্নেহ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। মাতা-পিতা, বুজুর্গ ও মুরুব্বিদের জন্য এর অর্থ হচ্ছে- আদব, সম্মান ও তাযীমের

প্রকাশ। বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী ও সমবয়সীদের জন্য এর অর্থ হল, সম্ভাষণ ও ভদ্রতা। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য সালামের অর্থ হল, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। আম্বিয়া ও আউলিয়াদের জন্য এর অর্থ হচ্ছে, দোয়া, আদব, সম্মান ও তাযীম। মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাঁড়িয়ে আমরা সালাম দিই, এই সালামের অর্থ, হচ্ছে দোয়া ও মাগফিরাত পাওয়ার আশায়। নবী করীম (সঃ) হচ্ছেন, রহমাতাল্লিল আলামীন, শাফিয়াল মুজনাবীন। তিনি রহমত বন্টনকারী এবং শাফায়াত দানকারী। তাঁর রহমতেই সৃষ্টি জগত সজিব ও সঞ্জীবিত। কারো পক্ষ থেকে নবী করীমের (সঃ) জন্য দোয়া এবং দয়ার প্রয়োজন নেই। এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ ও রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে সালামের অর্থ কি হবে? এক্ষেত্রে জানতে হয় যে, আল্লাহতায়ালা ও রাসুলের (সঃ) মধ্যে সম্পর্ক কি? নবী করীমকে (সঃ) হলেন, মহান আল্লাহতায়ালার প্রিয় হাবিব ও পেয়ারে দোস্ত। অতএব, আল্লাহ ও রাসুলের (সঃ) ক্ষেত্রে সালামের অর্থ হবে, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা বিনিময় করা।

ফেরেশতা ও ঈমানদার মুসলমানদের ক্ষেত্রে সালামের অর্থ কি হবে? এ ক্ষেত্রে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ফেরেশতাদেরও কারো পক্ষ থেকে দোয়া এবং দয়ার প্রয়োজন হয় না। তাঁরা মহান আল্লাহ ছাড়া কারো মুখাপেক্ষি নন। নবী করীমকে (সঃ) ফেরেশতাদের সালাম দেওয়ার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাঁরা নবী করীমকে (সঃ) সালাম দিয়ে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হন। যেমন, রাষ্ট্রপতির গার্ড অব রেজিমেন্টের সদস্যগণ। তাঁরা রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রীয় অতিথিদেরকে সালাম বা স্যালুট দিয়ে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হন। সেনাবাহিনীর সব সদস্যদের পক্ষে রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রীয় অতিথিকে সালাম দেওয়ার সুযোগ হয় না, কেবল রাষ্ট্রপতির গার্ড অব রেজিমেন্টের সদস্যরাই সালাম দিতে পারেন। তেমনি বায়তুল মামুর মসজিদে তোয়াফরত বিশেষ ফেরেশতারাই মহান আল্লাহতায়ালার পেয়ারে হাবীবের (সঃ) উদ্দেশে সালাম পেশ করে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হচ্ছেন। অনুরূপ মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ক্বিয়ামের (দাঁড়ান) সঙ্গে সালাম দেওয়ার সৌভাগ্য সবার হয় না। যাদের অন্তরে নবী করিমের (সঃ) মহব্বত সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, কেবল তারাই তাঁকে সালাম দিতে সক্ষম। নবী করীমকে সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দিয়ে তাঁরা নবী করীমের (সঃ) পক্ষ থেকে মহব্বত, নাযাত এবং মাগফিরাত লাভ করছেন। নবী করীমের (সঃ) মহব্বত লাভ করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে জানা যায়, মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিরাজ শরীফে গমনের সময়, আল্লাহতায়ালা দেখেন যে, একদল ফেরেশতা বায়তুল মামুর মসজিদ তোয়াফ করছেন এবং সুব্হানাল্লাহি

ওয়াবিহামদিহি সুব্হানাল্লাহিল আযীম পাঠ করছেন।
আল্লাহতায়ালা লক্ষ্য করলেন, ফেরেশতারা যে জিকির করছে, তাতে শুধু মহান আল্লাহতায়ালার প্রশংসা প্রকাশ পাচ্ছে। এখানে আল্লাহর হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা নেই। তখন আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ করেন যে, আমি আল্লাহ আমার হাবীবের প্রতি দরূদ-সালাম পেশ করি, তোমরাও আমার হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানে এবং মহব্বতে দরূদ-সালাম পেশ কর।
এখন প্রশ্ন হল যে, মহান আল্লাহতায়ালা যখন নবী করীমকে সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বত ও সম্মানে ফেরেশতাদের দরূদ-সালাম পেশ করার আদেশ দিলেন এবং তিনি (আল্লাহ) নিজেও ফেরেশতাদের নিয়ে দরূদ ও সালামের মজলিশ করলেন, তখন কি আল্লাহতায়ালা এবং ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে সালাতুস সালাম পাঠ করেছিলেন? নাকি বসে? এ ক্ষেত্রে বোঝা গেল যে, বসা অবস্থায় কোনকিছু তোয়াফ করা যায় না এবং আল্লাহতায়ালার উপস্থিতিতে ফেরেশতারা বসে থাকতে পারে না। অতএব, উপরোক্ত দরূদ ও সালামের মজলিশ নিঃসন্দেহে দাঁড়িয়ে অর্থাৎ ক্বিয়ামের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। হে সম্মানিত পাঠকগণ, আপনারা চিন্তা করে দেখুন।
কাজেই কোরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস সব রকম কিতাব পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে, কিয়াম করা মোস্তাহাব সওয়াব। আরবিতে বলা হয় কিয়াম, বাংলাতে বলা হয় দাঁড়ান, ইংরেজিতে বলা হয় ঝঃধহফ যেমন দেখা যায়, কামেল পীর-মুর্শিদ, বুজুর্গ ব্যক্তি আসলে তাঁদের সম্মানে আমরা দাঁড়িয়ে সালাম দিই ও তাযীম করতে হয়। বাবা-মা সামনে উপস্থিত হলে তাঁদের সম্মানে দাঁড়ানো, কোন সম্মানী ব্যক্তি সামনে এলে দাঁড়িয়ে যাওয়া, ওস্তাদ-শিক্ষক-গুরু উপস্থিত হলে দাঁড়িয়ে সম্মান করা। এছাড়াও দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মানে আমরা সাধারণত দাঁড়াই। অতএব, রসুল (সঃ)এর সম্মানে কিয়াম (দাঁড়নো) করা ভালো? না কি মন্দ? হে পাঠকগণ! আপনারাই চিন্তা করে দেখুন।

রাসুলে করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাযের-নাযের (প্রসঙ্গে): মৌ: আবুল কাসেম নানুতবীর হাল জযবা

ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসা একটি বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী আবুল কাসেম নানুতবী ছিলেন একজন বিশ্ববিখ্যাত আলেম। তিনি ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশ আমলে নিম্নেবর্ণিত আক্বীদা পোষণ করতেন।
'ইয়া রাসুলুল্লাহ' বলা জায়েয নয়। 'ইয়া রাসুলুল্লাহ' শব্দের অর্থ হল, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মুখে হাযের-নাযের তথা উপস্থিত আছেন। যেহেতু রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মুখে

হাযের-নাযের নেই, সেহেতু 'ইয়া রাসুলুল্লাহ' বলা জায়েজ নয়।
কিন্তু বিখ্যাত এ আলেম তার মৃত্যুর ছয় মাস পূর্বে তার আক্বীদা পরিবর্তন করেছিলেন। তার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, তিনি শুধু বলতেন, আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা 'ইয়া রসূলুল্লাহ' আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা 'ইয়া হাবীবাল্লাহ্' সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
মৌলভী আবুল কাসেম নানুতবী সাহেবের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তিনি চলতে-ফিরতে, মাদ্রাসা-মসজিদে, হাটে-বাজারে, শয়নে-স্বপনে শুধুই বলতেন, আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবআল্লাহ্' সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এ অবস্থায় তাঁর পরিবারের সদস্যরা, আত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী এবং মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ একান্তভাবে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হুজুর, আপনি পাগলের মত প্রলাপ বকছেন কেন?
উত্তরে মৌলভী সাহেব বলেছেন, আপনারা আমাকে পাগল মনে করছেন? আমি পাগলের মত করছি? আমি পাগল হয়েছি? না, আমি পাগল হইনি। যা সত্য, যা বাস্তব, আমি তাই করছি। আমি যেদিকেই তাকাই, শুধুই দেখছি, মহান রাসুলে করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সম্মুখে। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে কেউ কি সালাম না দিয়ে পারে? পারে না। (সূত্রঃ তাহরীকে দেওবন্দ)
রাসুলে করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় সব স্থানে হাযির-নাযির
ইন্না-আরসালনা-কা শা-হিদাওঁ ওয়া মুবশ্বিরাওঁ ওয়া নাজিরা (৪৮ নং সূরা, ফাতাহ, ৮ নং আয়াত)
অর্থঃ (হে হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), নিশ্চয়ই আমি আপনাকে হাযের-নাযের বা প্রত্যক্ষকারী সাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী নবী-রাসুল হিসাবে প্রেরণ করেছি (সূরা ফাতাহ, (৪৮:৮)।
শাহিদ অর্থ হাযের-নাযের এবং প্রত্যক্ষকারী সাক্ষী। সাক্ষীকে শাহিদ এজন্য বলা হয় যে, তিনি ঘটনাস্থলে হাযের-নাযের অর্থাৎ উপস্থিত ছিলেন। রসুলে করীম সল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামকে (মাহবুব) শাহিদ এজন্য বলা হয় যে, তিনি মু'মিনের হৃদয়ে হাযের-নাযের বা উপস্থিত থাকেন, (৩৩:৬)। হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাহাবুবিয়াত মানব ও যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি আল্লাহতায়ালার মাহাবুব এবং আল্লাহতায়ালা সমগ্র জগতের মাহাবুব। শুষ্ক কাঠ, পাথর, পশু-পাখি ইত্যাদি হুজুরের বিচ্ছেদে কান্না করে। স্রষ্টার দরবারে তিনি সৃষ্টির সাক্ষী, সবার ফয়সালা হবে তাঁর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে। সৃষ্টির সামনে স্রষ্টার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আল্লাহতায়ালা হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শনকে সাক্ষ্য সহকারে উল্লেখ করেছেন। হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যক্ষ

করেই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। তিনি মিরাজ শরীফে জান্নাত, দোযখ, ফিরিশতাদের এবং আল্লাহতায়ালাকে স্ব-চোখে দেখেছেন।
আল্লাহ রব্বুল আলামীন হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের সাক্ষীস্বরূপ প্রেরণ করেছেন, তিনি আমাদের কৃতকর্মের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আমরা কোথায় কি করি, কি ইবাদত করি, কাকে ঠকাই, কার উপর অন্যায় করি, কার উপর জুলম করি, দৈনন্দিন কাজকর্ম সবকিছুরই তিনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী। হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষী ছাড়া আল্লাহতায়ালার কাছে কোন ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। দুনিয়াতে কোন বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় কোন সাক্ষী যদি বলে, স্বপন-সাগরের টাকা চুরি করেছে, তা সে শুনেছে, তবে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, কার কাছ থেকে শুনেছে? সেক্ষেত্রে যে শুনে সাক্ষ্য প্রদান করে, সে গৌণ হয়ে যায়, মুখ্য থাকেন যার কাছ থেকে শুনে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে। শোনা সাক্ষীর উপর বিচারক কোন ফয়সালা দিতে পারেন না। হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সমস্ত ভাল-মন্দ কাজের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। শেষ বিচারের দিনে হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষীর উপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের বেহেশত-দোযখের ফয়সালা দিবেন।
সূরা মোজাম্মেল, আয়াত-১৫ তে আল্লাহতায়ালা আরোও বলেন, ইন্না আর্সাল্ না ইলাইকুম্ রসুলান্ শা-হিদান্ 'আলাইকুম্' অর্থ: নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে একজন রসুল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের হৃদয়ে হাযের-নাযের উপস্থিত, প্রত্যক্ষ সাক্ষীদাতা।
উপরোক্ত আয়াতে করীমায় আল্লাহতায়ালা বলেছেন যে, নিশ্চয় রাসুল (সঃ) তোমাদের কাছে হাযের-নাযের বা প্রত্যক্ষ সাক্ষীদাতা। মূলত নবী করিমকে (সঃ) আল্লাহতায়ালার স্বত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যেভাবে আল্লাহতায়ালা সব সময়, সব স্থানে হাযের-নাযের তেমনি নবী করিমকে ও (সঃ) সব সময়, সব স্থানে হাযের-নাযের বা উপস্থিত থাকেন। তিনি আল্লাহতায়ালার নূর থেকেই সৃষ্ট এবং তাঁর নূর থেকেই আল্লাহতায়ালা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেছেন।
কিয়ামে মিলাদ হল চধৎঃ ড়ভ ঝযধভধুধঃ অর্থাৎ, শাফায়াতের অংশ। কিয়ামে মিলাদের মূল ভিত্তি হল আল্লাহতায়ালার জিকির, দরূদ শরীফ ও নবী করীমের (সঃ) উদ্দেশ্যে তাযিমের সঙ্গে সালাম পেশ করা। সালাম দেওয়া সুন্নত, সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব এবং দরূদ পড়া ফরজ। মিলাদে নবীজিকে (সঃ) সালাম দেওয়া হলে নবীজি (সঃ) খুশির সঙ্গে আমাদেরকে সেই সালামের উত্তর দেন। নবীজিকে (সঃ) সালামকারীদের মাগফেরাতের জন্য ফেরেশতারা আল্লাহতায়ালার দরবারে দোয়া করেন। এমনিভাবেই মিলাদ আয়োজনকারী ও কিয়ামে মিলাদে অংশগ্রহণকারীরা শাফায়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

শরিয়তের দৃষ্টিতে ছবি রাখার বিধান

সূরা বাকারাহ্ (রুকু ৩২) ২৪৮ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– অক্ব-লা লাহুম্ নাবি-য়্যুহুম্ ইন্না আ-ইয়াতা মুলকিহী-আইঁ ইয়া'তিয়াকুমুত্ তা-বূতু ফীহি সাকীনাতুম্ মির্ রব্বিকুম্ অবাক্বিয়্যাতুম্ মিম্মা-তারাকা আ-লু মূসা-ওয়াআ-লু হা-রূনা তাহ্মিলুহুল্ মালা-য়িকাহ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্লাকুম্ ইন্ কুনতুম্ মু'মিনীন্।

অর্থ: তাদেরকে তাদের নবী বললেন, তার বাদশাহীর নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট তাবূত আসবে, যার মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চিত্ত-প্রশান্তি রয়েছে এবং অবশিষ্ট বস্তু, সম্মানিত মুসা ও সম্মানিত হারুনের পরিত্যক্ত; সেটাকে ফেরেশতারা বহন করে আনবে। নি:সন্দেহে এর মধ্যে মহান নিদর্শন রয়েছে তোমাদের জন্য, যদি ঈমান রাখো।

তাফসীরে কান্যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান

টীকা (৫০৪)এ 'তাবূত' শামশাদ কাঠের তৈরি একটা স্বর্ণ-খচিত সিন্দুক ছিলো, যার দৈর্ঘ্য তিন হাত এবং প্রস্থ দুই হাত ছিলো। সেটাকে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)এর উপর নাযিল করেছিলেন। এর মধ্যে সমস্ত নবী (আঃ)এর ফটো রক্ষিত ছিলো। তাঁদের বাসস্থান ও বাসগৃহের ফটো ছিলো এবং শেষ ভাগে হুজুর সৈয়দে আম্বিয়া (নবীকুল সরদার) সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের এবং হুজুর করীম (সাঃ)এর পবিত্রতম বাসগৃহের ফটো একটা লাল ইয়াকূতের মধ্যে ছিলো, যাতে হুজুর (সাঃ) নামাজেরত দণ্ডায়মান-অবস্থায় এবং তাঁর (সাঃ) চারপাশে সাহাবাহ কেরাম। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম সেসব ফটো দেখেছেন। সিন্দুকখানা বংশ পরম্পরায় হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত পৌঁছলো। তিনি এর মধ্যে তাওরীতও রাখতেন এবং তাঁর বিশেষ বিশেষ সামগ্রীও। ছবির ঘটনা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) প্রণীত বিশ্বখ্যাত তাফসীরে মাজহারী ১ম খণ্ডে বর্ণিত আছে, যে সমস্ত মানুষ এই ছবি নিয়ে সমালোচনা করে, তারাই এই ছবি সর্বদা বহন করে ইবাদত বন্দেগী করেন বা চলাফেরা করেন। দেখা যায় যে, মানুষের জীবনে চলতে গেলে সর্ব প্রথম টাকা-পয়সার প্রয়োজন। সেই টাকাতেই ছবি আছে যা সকলেই ব্যবহার করেন।

দ্বিতীয়ত জাতীয় পরিচয় পত্রে ছবি আছে, বিদেশ ভ্রমণ বা হজ্ব করতে গেলে (পাসপোর্ট) ছবি লাগে, কর্মস্থলে ছবি লাগে, ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠানে পরিচয়পত্র ও অন্যান্য কাজে ছবি লাগে, জমি ক্রয়-বিক্রয় করতে গেলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের ছবি লাগে, প্রতিটি সরকারি অফিসে রাষ্ট্র প্রধান বা সরকারের ছবি বাধ্যতামূলক রাখতে হয়। এমনকি ইসলামের নাভি-মূল সৌদি আরবের রাজা-বাদশাহর ছবি রিয়েলে (সৌদি মুদ্রা) মুদ্রিত আছে এবং তাদের ছবি অফিস-আদালতে বাধ্যতামূলক রাখতে হয়। এ ছাড়াও যে সমস্ত আলেম সম্প্রদায় ছবি নিয়ে সমালোচনা করে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বক্তৃতা করেন, সেখানে তাদেরই ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে। দৈনিক পত্রিকাসহ আরো কত শত গণমাধ্যমে নিজেদেরসহ সহস্র ছবি ছাপা হচ্ছে! এ নিয়ে তাদের কোনো জবাব আছে কি? এছাড়াও দেখা যায় যে, টিভি চ্যানেলে এবং পত্র-পত্রিকায় বাণিজ্যিকভাবে তাদের প্রকাশিত সিডি-ক্যাসেটের মোড়কে ছবি ব্যবহার করেন। তাই পাঠকগণ আপনারা একটু চিন্তা করে দেখুন, ছবির প্রয়োজন বা দরকার আছে কিনা।

আল্লাহতায়ালা কোরআন মজিদে তাঁর বন্ধু অলি-আউলিয়াদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষদেরকে সতর্ক করেন

আলা ইন্না আওলিয়া আল্লা-হি লা-খাওফুন ‘আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্যানূন। আল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া কা-নূ ইয়াত্তাকূন। লাহুমুল্ বুশ্‌রা-ফিল্ হায়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া ওয়াফিল্ আ-খিরাতি; লা-তাব্‌দীলা লিকালিমা-তিল্ লা-হি; যা-লিকা হুওয়াল্ ফাওয়ুল ‘আজীম। (সূরা ইউনুস, আয়াত, ৬২-৬৪)

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালা সবাইকে সর্তক করে বলেন, সর্তক হও! জেনে রাখো, আল্লাহর বন্ধুঅলি-আউলিয়াদের কোন ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাযুক্তও হন না। যাঁরা বিশ্বাস করেন এবং সাবধানতা অবলম্বন করেন, তাঁদের জন্য ইহকাল ও পরকালের জীবনে সুসংবাদ আছে, আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, এটিই মহা সাফল্য।

অ-লাক্বদ কাতাবনা-ফিয্যাবূরি মীম বা’দিয্ যিক্‌রি আন্নাল আরদ্বা ইয়ারিছুহা-ইবা-দিয়াছ্ ছলিহুন। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৫)

অর্থ: (প্রিয় হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ’ আপনার মহব্বতে আমার মাহাবুব বান্দাদেরকে পৃথিবীর স্বত্ত্বাধিকারী করে তা, আমার লওহে মাহফুজে লিখে রেখেছি।

ওয়ামাই ইউত্বি‘ইল্লা-হা ওয়ার রাসূলা ফাউলাইকা মা’আল্লাযীনা আন’আমাল্লা-হু আলাইহিম মিনান নবিয়্যীনা ওয়াছ্‌ছিদ্দীকীনা ওয়াশশুহাদাই ওয়াছ্ ছালিহীনা, ওয়া হাসু-না উলা-ইকা রাফীক্বা। (সূরা নিসা, আয়াত: ৬৯)

অর্থ: সত্যবাদী, শহীদ ও সিদ্দীকগণ আল্লাহ ও রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশেক। তাঁরা বেহেশতে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী হবেন, তাঁরা কতই না সুন্দর।

হযরত আলী (রা.) ইরশাদ করেন যে, আমার অন্তরে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা এমনকি শীতল পানি অপেক্ষাও মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা অধিক প্রিয় (হাদিস : মাদারেজুন নবুয়্যত)। নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোনো মৃত্যু নেই, বরং তাঁরা স্থানান্তরিত হয়, ধ্বংসশীল ইহজগৎ থেকে স্থায়ী পরজগতে (আল হাদিস)। নিশ্চয়ই আমার বন্ধুগণ আমার জুব্বার অন্তরালে অবস্থান করেন। আমি এবং আমার আউলিয়াগণ ব্যতীত তাদের পরিচিতি সম্বন্ধে কেউ অবগত নয় (আল হাদিস)।

কেরামাতুন আউলিয়াই হাক্কুন।

অর্থ: আউলিয়াদের কেরামত ক্ষমতা সত্য (আল হাদিস)।

আল আউলিয়াও রায়হানুল্লাহ।

অর্থ: আউলিয়াগণ আল্লাহর সুবাস (আল হাদিস)।

‘ওয়ালা-তাহ্‌সাবান্নাল্লাযীনা কূতিলূ ফী সাবীলিল্লা-হি আমওয়া-তা; বাল আহ্‌ইয়া উন ইন্দা রাব্বিহিম ইউরযাকূন’। অর্থ: যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে; তাদেরকে মৃত মনে করো না, তারা বরং জীবিত, নিজের রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত, নিজের রবের পক্ষ থেকে রিযিকও প্রাপ্ত।

‘ওয়ালা-তাকুলূ লিমাই ইউক্বতালু ফী সাবীলিল্লা-হি আম্‌ওয়া-তা; বাল আহইয়া উওঁ ওয়ালা-কিল্‌লা-তাশ’উরূন’। (সূরা বাক্বারা, আয়াত : ১৫৪)।

অর্থ: যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে; তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা জানো না।

ওয়া আন আবি হুরাইরাতা (রা.) ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি (সঃ) ইন্নাল্লাহা তায়ালা মান আদালী অলি আন ফাক্বাদ আ-জানতুহু বিল হারবি, ওমা তাকাররাবা ইলাই ইয়া আবদি বি-শাইয়্যিন আহাব্বু ইলাই ইয়া মিম্মাফ তারতু আলাইহি অলা ইয়াজালু আবদি ইতাকাররাবু ইলাই ইয়া বিন্না ওয়াফিলি হাত্তা আহ্ বাবতুহু ফা-ইযা আহ্ বাবতুহু ফাকুনতু সাম আ-হুল্লাজি ইয়াসমাউ বিহি ওয়া বাছারা হুল্লাজি ইউবুসিরু বিহি ওয়া ইয়াদাহুললাতি ইয়ুবতিসু বিহা ওয়া রিজলাহুল্লাতি ইয়ামশি বিহা ওয়া ইন-সা আলানি লা-উতি আন্নাহু ওয়ালা ইন আসতায়া জানিলায়্যি জান্নাহু ওমা তারাদ্দু আনসাইয়্যিন আনা ফা-ইলাহু তারাদুদি আন নাফসিল মুমিনি ইকবাহুল মাওতা ওয়া আন আকরাহু মাসা আতুহু ওলা বুদদালাহু মিনহু। (রওয়াহুল তিরমিযি) বুখারী/তিরমিযী

অর্থ: প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহতায়ালা বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি আমার কোনো প্রিয় বান্দাকে আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কারণে শত্রু মনে করে, তবে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। অর্থাৎ আমার প্রিয় বান্দার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা মানে আমার সঙ্গেই যুদ্ধ করার নামান্তর। আর আমি যা কিছু আমার বান্দার ওপর ফরজ করে দিয়েছি, শুধু তা পালন করেই কোনো বান্দা আমার নৈকট্যলাভ করতে পারবে না। সুতরাং আমার প্রিয় বান্দারা ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি নফল ইবাদতের মাধ্যমেই সদাসর্বদা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। ফলে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। আর যখন আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যে কান দিয়ে সে শ্রবণ করে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যে চোখ দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যে হাত দিয়ে সে স্পর্শ করে। আমি তার পা হয়ে যাই, যে পা দিয়ে সে হাঁটে।

অর্থাৎ, তার চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদি সবই আমার করুণা পরিবেষ্টিত হয়ে যায়। অনন্তর সে যদি আমার নিকট কোনো কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাৎক্ষণিক তা প্রদান করি। যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি। আমি যে কাজ করতে চাই, তা করতে কোনো দ্বিধা-সংকোচ করি না, যতটা দ্বিধা-সংকোচ করি একজন মুমিনের জীবন সম্পর্কে। কেননা সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, অথচ আমি তার বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করি।

টীকা: (ফাক্বাদ আজান্তুহু বিল হারবি) অর্থ: আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করি' এই বাক্যটির মর্ম হল, আল্লাহর অলির সঙ্গে কোনো প্রকার বেয়াদবী করা কিংবা শত্রুতা করা, আল্লাহর কাছে তা খুবই অপছন্দনীয় এবং ঘৃণিত কাজ। সে কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহারকারী বা শত্রুতাকারীর সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়েছে। অথবা অলির সঙ্গে বেয়াদবীর মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহর সঙ্গে বেয়াদবী করা হয়, সে জন্যেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়েছে।

মান নাদানি বি-ইসমী ফি-কুরবাতীন কুশিফাত ওয়ামান ইসতাগাসা বি-ফি-শিদ্দাতিন কুরিজাত, ওয়ামান তাওয়াসালা বি ইলাল্লাহি ফি হা-জাতীন কুদিয়াত (বাহজাতুল আসরার)।

অর্থ: যদি কেউ পেরেশানীতে পড়ে আমার সাহায্য চায়, তবে তার পেরেশানী দূর হয়। যদি কেউ কঠিন বিপদে পড়ে আমার সাহায্য চায়, তবে তার বিপদ দূর হয়। কেউ আমার উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চায়, মহান আল্লাহতায়ালা তার বাসনা পূর্ণ করেন, (গাউসুল আযম আবদুল কাদির জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, (বাহজাতুল আসরার)।

আন আবি হুরাইরাতা রাদিআল্লাহু-তায়ালা আনহু ক্বালা ক্বালা রসূলুল্লাহি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রব্বু আশআছা, আগবারা মাদফুইন, আনিল আবওয়বী, লাও আক্বসামা আলাল্লাহি লা আবরাহু (রওয়াহু মুসলিম)।

অর্থ: হযরত আবু হোরায়রা রাদিআল্লাহু-তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এমন অনেক উসকো-খুশকো লম্বা চুলধারী ধূলামলীন বিশিষ্ট লোক আছে, যাদেরকে মানুষের দরজা থেকে বিতারিত করা হয়, অথচ তারা যদি আল্লাহর কাছে কিছু দাবী করে, তাহলে আল্লাহ তাদের সে দাবী পূরণ করেন (মুসলিম শরীফ)।

ক্বালা সাইদু জমালু মাক্কী ফি ফাত্তাওয়াহু সুইলতু আম্মান ইয়াকুলু ফিশ্‌শিদাইদি ইয়া রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আও ইয়া শ্বাইখ আব্দুল ক্বাদির আল জিলানী শাইয়ান লিল্লাহি আও ইয়া আলীইউন হাল হুয়া যাইজিন আমলা ফাকুতু নাআম হুয়া আমরুন মাশরুউন ওয়া শাইউন মারগুবুন, লা ইউনকিরুহু ইল্লা মুতাকাব্বিরু আও মুয়ানিদুন ওয়াহুয়া মাহরামুন আন ফুউযিল আউলিয়া ইল্লাকিরামী ওয়া বারাকাতীহীম (বাহজাতুল আসরার)।

অর্থ: সৈয়দ জামাল মক্কী তাঁর এক ফতোয়ায় বলেছেন, আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি কঠিন বিপদে পড়ে সাহায্যের আশায় 'ইয়া রসুলুল্লাহ' অথবা 'ইয়া শেখ আবদুল কাদির শাইয়ান লিল্লাহ' অথবা 'ইয়া আলী' বলে ডাক দেয়া জায়েজ কি না? তদুত্তরে আমার মত হচ্ছে, এরূপ সাহায্য চাওয়া শরিয়ত মোতাবেক জায়েজ ও উত্তম। অহংকারী অথবা শত্রু ব্যতীত কেউ এটা অস্বীকার করে না। যে অস্বীকার করে, সে অবশ্যই আউলিয়াকিরামদের ফয়েজ ও বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে (সৈয়দ জামাল মক্কী, মক্কার মুফতি)।

আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর দৃষ্টিতে এলমে তাসাউফ শিক্ষা ফরজ হওয়ার দলিল

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহাম্মদ মুজ্‌তবা (সঃ)-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করা কি ফরজ? উত্তরে হযরত বলেছেন, হ্যাঁ, ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করা ফরয। যেহেতু আল্লাহতা'য়ালা বলেছেন, 'ইত্তা কুল্লাহা হাক্‌কা তুক্বাতিহি' তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় কর। যার পারিভাষিক অন্য নাম তাসাউফ। এখানে ব্যবহৃত শব্দের মধ্য দিয়ে ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। অবশ্য এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরামগণ অক্ষমতার আবেদন করায় অন্য আয়াত 'ফাত্তা কুল্লাহা মাস্‌তা তা-তুম' নাযিল হওয়ায় অনেকে একে নাসেক বলে গণ্য করে, আগের নির্দেশরহিত সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু আল্লামা থানভী (রহ.) বলেছেন যে, তাফসীরের পারিভাষিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে রহিত হওয়ার বিষয় পরিষ্কার হয় না। বরং আমার গবেষণায় এখানে পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে আগের আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখা করা হয়েছে। কারণ, এর আগের আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছিল তাৎক্ষণিকভাবে আয়াতের বর্ণিত হুকুম অনুযায়ী আমল করা ফরজ। যা সাহাবায়ে কেরামগণ কঠিন মনে করেছিলেন। অতঃপর আয়াতের তাফসির হিসাবে আল্লাহতায়ালা 'ফাত্তা কুল্লাহা মাস্‌তা তা-তুম' আয়াত নাযিল করে সাহাবাদের সংশয় দূর করে দেন।

শরিয়ত ও মারেফতের জ্ঞান ছাড়া কেউ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হতে পারবেন না

হযরত মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রহ.) সাহেবের 'মকতুবাতে ইমামে রাব্বানী' নামক কিতাবে আছে, আখবার মে আয়া কাহ্ আল ওলামায়ু ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া ওলামায়ুল আম্বিয়ায়ে আলাহিছ সালাতুস সালামকে ওরেছ হে। ও এলেম জু আল আম্বিয়ায়ে আলাহিস সালাতু ওয়া তাসলিমাত ছে বাক্বী রাহা হে। ও দো কেছেম কা হায় এক এল্‌মে আহকাম, দুছরে এলমে আসরার আওর এলমে ওয়ারেস হো। ছখছ্ হে জিন কো উনদুনুছে হেচ্ছা হাসেল হো। ইহাকা ছখছ্ জিছকো একহি কেছিম কা এলমে নসিব হো আওর দোছরা এলমে এসকা নসিব না হো কাহ্ এক বাত ওরেছাত কে মুনাফি হে। কিউ কে ওরেছ কে সব কেসেম তার কা-ছে হেচ্ছা হাসেল হোতা হায়। নাকে বাছ কো ছুরকার বাছে আওর ওহ্ ছখ্ছ জিছকো বাছ মাইয়্যিন মে ছে হেচ্ছা মিলতা হায়। ও গারমা ইয়ানী ক্বরছ্ খাওয়াহো মে দাখেল হায়। কা জিছ্কা হেচ্ছা উস্‌কে হক ইয়া জিনছে তায়াল্লুক হায়। আওর আইছিহি আ-হযরত আলাইহি ওয়ালা আলীহিস সালাতু ওয়াস সালাম নে ফরমায়া হে, ওলামাই উম্মাতি কা আম্বিয়ায়ে বানি ইসরাইল মেরি উম্মতকে উলামায়ে বানি ইসরাইল কে নবী-উ কি তারাহে ইন ওলামাউ-ছে মুরাদ ওলামায়ে ওরেছ হে। নাহ্ কে ঘরমা কে জিনহু-নে বাছ তার-কাছে হেচ্ছা লিয়া-হে। কিউকে ওরেছ-কু ক্বার্‌ব জিনছিয়াত কে লে-হাসছে মুওত্ কি মানান্দ কাহ-সেক্‌তি হে বরখেলাফ গরীমা-কে কা-আলাফাছে চাল্লি হে।' (মাকতুবাতে ১ম খণ্ড পৃ: ২৬৮-৫৪০)

হযরত রাসুলে করীম (সঃ) বলেছেন, আলেমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিশ। অর্থাৎ, পয়গম্বরগণ যে ইলেম দুনিয়াতে রেখে গেছেন, তা দুই ভাগে বিভক্ত। (১) ইলমে শরিয়ত বা জাহেরী বিদ্যা, (২) ইলমে এছ্‌রার বা তত্ত্বজ্ঞান। যিনি এই দুই রকম ইলমের অধিকারী হয়েছেন, তিনিই প্রকৃত ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া বা নায়েবে নবী। যিনি মাত্র একটি ইলমের অধিকারী হয়েছেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে পয়গম্বরের ওয়ারিশ নন। যেহেতু পরিত্যক্ত সম্পত্তির সব বিভাগ থেকে অংশের অধিকারী হওয়াকেই ওয়ারিশ বলে। আর যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন নির্দিষ্ট অংশ পাওয়ার অধিকারী হবে সে গরিব বা সম্পত্তিবিশেষের আংশিক অংশীদার মাত্র। হযরত রাসুল (সঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে আলেমগণ বনী ইসরাইল বংশীয় পয়গম্বরগণের সদৃশ বা সমান। এই হাদিসের মর্মার্থে দুই প্রকারের ইলেমের অধিকারীগণকেই 'আলেম' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে যাঁরা কোন এক বিষয়ে মাত্র শিক্ষা লাভ করেছেন, তাঁরা আলেম নন।

হযরত মওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী সাহেব তাঁর 'কৌলুচ্ছাবেৎ' কিতাবে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন এবং 'জাদুত্তাকোয়া' নামক কিতাবে লিখেছেন, মাত্র শরিয়ত শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেমগণ মারেফত আমল অনুসরণ ছাড়া ফাছেক। তাকে নায়েবে নবী বা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া বলা চলে না।

মেশকাত শরীফের শরাহ্ মেরকাত শরীফের ১ম খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে, ইন্নাহু-লা ইয়াতাহাক্কাকু সাইয়ুন মিনএলমে বাতেনী ইল্লা বা'দাল হাকিকী বিএসলাহীর জহিরী কামা ইল্লা এলমে জহেরী রা ইয়াতিমু ইল্লা বি-এসলাহিল বাতেনী ওয়ালি হাজা ক্বলা ইমামু মালেকু মান তাফাক্কাহু ওলাম ইয়াতা ছাওফুন ফাকাদ তাহাক্কাকু ওয়ামান তাছাউফা ওরাম ইয়াতা ফাক্কাহু ফাকাদ তা জিন্দিকুন ওমান জামা-য়া বাইনাহুমা ফাকাদ তাহাক্কাকু ওক্বালা আবু তালেবুল আল-মাক্কী মিম্মা এলমানে লা ইয়াস তাগমী আহাদু হুমা আনিল আখেরী বিমুনজিল্লাতিল ইসলামে ওয়াল ঈমানী মুরাত্তাবাতু কুল্লু মিনহুমা

বিল আখেরী কালজিসমী ওয়াল ক্বালবী লা ইয়ান কাউকা আহাদুন আন ছহেবী।'
অর্থাৎ, ইলমে শরিয়ত অবলম্বন না করতে পারলে মারেফত হাসিল হয় না। একইভাবে মারেফত হাসিল না করলে পূর্ণ শরিয়ত আদায় হয় না। এগুলোর একটি অপরটির পরিপূরক। অর্থাৎ, একটি ছাড়া অন্যটি পূর্ণ হয় না। এ কারণেই হযরত ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাত্র ইলমে তাসাউফ আমল করল কিন্তু ফিকাহ্‌ের (শরিয়ত) আমল করল না, ওই ব্যক্তি জিন্দিক (কাফের) আর যে কেবল ফিকাহ্‌ের আমল করল, কিন্তু তাসাউফ আমল করল না, ওই ব্যক্তি ফাছেক। যে ব্যক্তি উভয় আমলই করল, সে ব্যক্তিই হক রাস্তায় আছেন।
ওই কিতাবে আবু তালেব মক্কি বলেছেন যে, উক্ত দুই প্রকার ইলেমই আসল। একটি ছাড়া অপরটি পূর্ণ হয় না। যেভাবে ইসলাম ও ইমান। এই দুইটি ইলেমের মধ্যে এমন সম্পর্ক যেমন, একটি দেহ অপরটি প্রাণ। অর্থাৎ, একটি ছাড়া অপরটি কায়েম থাকতে পারে না। ওইভাবে শরিয়ত ও মারেফতের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। একটি ছাড়া আপরটি পূর্ণ হয় না। এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, যাঁরা চারটি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে থাকে এবং যাঁরা মাত্র একটি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে থাকে, তাঁদের জ্ঞান ও বুদ্ধি সমান হবে কি না? অর্থাৎ, যাঁরা শরিয়ত, তরিকত হকিকত ও মারেফত এই চারটি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে থাকে এবং যাঁরা মাত্র (জাহেরা) শরিয়তে পারদর্শিতা লাভ করে থাকেন। তাঁদের জ্ঞান ও বুদ্ধি সমান হবে কি না? এ স্থলে জ্ঞানী মাত্রই চারটি বিদ্যায় বিদ্বানদের বেশি জ্ঞানী ও তাঁদের বুদ্ধিকেই নির্ভুল ধরে নিবেন। আর চারটি বিদ্যায় বিদ্বানদের কোন ভুল-ভ্রান্তি একটি বিদ্যায় যারা বিদ্বান, তারা কখনও ধরতে পারেন না। কিন্তু একটি বিদ্যায় বিদ্বানদের ভুল-ত্রুটি চারটি বিদ্যায় বিদ্বানগণ সব সময়ই ধরতে পারেন। সুতরাং, চারটি বিদ্যার বিদ্বানদের জ্ঞান বা বুদ্ধিকেই নির্ভুল মনে করতে হবে। এ কারণেই আল্লাহতায়ালা একশ বছর পর পর পৃথিবীতে মোজাদ্দেদ পাঠিয়ে থাকেন। এই হাদিসটির ব্যাখ্যা এর আগে করা হয়েছে।
'ইন্নাল্লাহা আজ্জা ওয়া জাল্লা এয়াবআছু লিহাজিহিল উম্মাতি আলা রাছি কুল্লি মিআতিম মিন ছানাতিন এয়াজদাদু লাহা দী-নাহা।' (রাওয়াহু আবু দাউদ)
অর্থাৎ, নিশ্চয় মহান আল্লাহ একশ বছর পর পর উম্মতের জন্য এমন এক ব্যক্তি সৃষ্টি করবেন। যিনি দ্বীনকে (ধর্মকে) সতেজ ও সজীব করবেন। আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেছেন, জগতে মোজাদ্দেদ রূপে যিনি আসেন, তিনি উপরোক্ত চারটি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন।
মেশকাত শরীফের বঙ্গানুবাদে আছে, মোজাদ্দেদ ইসলাম ধর্মে যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতি-নীতি ধর্মনীতি বলে কুখ্যাত হয়, তা দূরীভূত করবেন। সহি হাদিস শরীফে আছে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– মিনহা জাহেরু ওয়া বাতেনু।'
অর্থাৎ, কোরআনের দুই প্রকার অর্থ: একটি জাহের অপরটি বাতেন। যাঁরা উল্লেখিত চার ধরনের ইলেম শিক্ষা লাভ করেন, তাঁরা কোরআন-হাদিসের জাহের ও বাতেন বা গভীর তত্ত্ব জানতে ও বুঝতে সক্ষম হন। আর যাঁরা মাত্র (জাহের) শরিয়ত শিক্ষা করেন, তাঁরা কোরআন-হাদিসের জাহেরী অর্থ বুঝতে সক্ষম হন, কিন্তু বাতেনী অর্থ বা গভীর তত্ত্ব বুঝতে পারেন না। কাজেই যাঁরা কোরআন-হাদিসের গভীর তত্ত্ব বুঝতে অক্ষম, তাঁরা কোন প্রকারেই পয়গম্বরগণের ওয়ারিশ হতে পারেন না। চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহতায়ালা বলেছেন– ইউছাব্বিহু লিল্লাহি মা ফিছ-সামা ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদি।'
অর্থাৎ সাত তবক আসমান ও জমিনের ভিতর যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহর জিকির করছে। দেখা যাচ্ছে আগুন, পানি, মাটি, বাতাস, বৃক্ষলতা, ঘোড়া, গরু, পশুপাখি যা

কিছু সাত তবক আসমান জমিনের ভিতর রয়েছে, সবাই-ই আল্লাহর জিকির করে আসছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, যাঁরা মাত্র জাহেরা বিদ্যা শিক্ষা করে থাকেন, কিন্তু ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করেন না, তারা ওই সব আগুন, পানি, মাটি, বাতাস, গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদির জিকির শুনতে পারে কি না? দেখা যাচ্ছে, কেউ যদি জাহেরী বিদ্যার সাগরও হয়, তবুও ওই সব জিকির শুনতে সক্ষম হয় না। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি জাহেরী লেখা পড়া কিছু নাও জানেন, সে যদি কোন অলিয়ে কামেলের কাছে থেকে ইলমে তাসাউফ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন, তবে ওই ব্যক্তি আগুন, পানি, পশুপাখি ইত্যাদির জিকির শুনতে পায়। ওই সব জিকির শ্রবণ করা বেশি কঠিন বিষয় নয়। অতি সহজ বিষয়। যাঁরা ওই সহজ বিষয়টি শুনতে বা বুঝতে সক্ষম হন না, তাঁরা কোরআন-হাদিসের বাতেন ও গভীর তত্ত্ব কী করে বুঝবে? তা কখনও হতে পারে না। কাজেই তাঁরা কখনও পয়গম্বরগণের ওয়ারিশ হতে পারেন না।

ইলমে তাসাউফ ছাড়া শরিয়ত পূর্ণ হবে না। হযরত মাওলানা কেরামত আলী (রহ.) সাহেব তাঁর 'জাদোত্তাকোয়া' নামক কিতাবের হাদিসে জিবরাইল (আঃ)-এর মর্মার্থে লিখেছেন– কাহে দীন বুলতি হ্যায় ইসলাম , ঈমান ও ইহসান সাবকো মিলাকে আওর শরীয়াতে নাম হে। ইছ মাজমু ওয়া কা আওর ভী দরমাইয়া হে, কাহে ফিকাহ আওর তাসাউফ আওর কালাম আপস মে এককু এককু লাজেম হে, একছে দুছরা আলাগ নেহী উনমে ছে এক বে দুছরে কে পুরা নেহী হুতা হে।'

অর্থাৎ- ইসলাম, ঈমান ও এহ্ছান এই তিনটি মিলে শরিয়ত। তিনি আরো বলেছেন, ফিকাহ্, তাসাউফ ও আকায়েদ প্রভৃতি সমাধাণের জন্য এবং তা যথার্থভাবে প্রতিপালন করতে একটি অপরটির দিকে বিশেষভাবে মুখাপেক্ষি। আবার মূলে একটি থেকে অপরটি ভিন্ন এবং একটি ছাড়া অপরটি পূর্ণ হতে পারে না। উক্ত কিতাবে আরও আছে– আহকাম ইনহী বে-ফেকা পৌঁছানী নেহী জাতে আওর ফিকাহ্ বে তাসাউফ কে পুরী নেহী হুতী।'

অর্থাৎ, খোদাতায়ালার আদেশগুলি ফিকাহ্ ছাড়া জানা যায় না এবং মারেফত ছাড়া ফিকাহ্ পূর্ণ হয় না। পীরের খেদমত ছাড়া ইলমে তাসাউফ হাসিল হয় না। মাওলানা কেরামত আলী (রহ.) সাহেব উক্ত 'জাদোত্তাকোয়া' কিতাবে আরো লিখেছেন– 'আওর এভী মা'লুম হো চুকা কাহ্ ফিকাহ্ কে মোওয়াফেক আমল ভী বে তাছাউফ কে দুরস্ত নেহি হোতা, তু-আব ছাবেত হুয়া কেহ মুমিন কো তাছাউফ ফর আমল করনে কী বরে হাজত হে, আওর তাছাউফ ফর আমল করনা বেগায়ের ছোহবত আওর তালিমে মুর্শিদ কামেল কে জু তাছাউফ ছে ওয়াক্কেব আওর ইস ফর আমল হে মোনজিল নেহী।'

অর্থাৎ, তাসাউফ ছাড়া ফিকাহ্ের আমল পরিপূর্ণভাবে করা যায় না। সুতরাং এর মাধ্যমে প্রমাণ হয়, তাসাউফ আমল করা প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির জন্য অবশ্যই কর্তব্য। যাঁর তাসাউফের পূর্ণ জ্ঞান আছে এবং যে তা আমল করে তবুও একজন উপযুক্ত পীরের সোহবত (সংস্রব) ও তালিম (শিক্ষা) ছাড়া তেমনভাবে সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব হয় না।

নামাজে হুজুরি দিল না হলে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি না হলে এবাদত গ্রহণযোগ্য হয় না

সহিহ্ হাদিস শরীফে আছে– 'লা-সালাতা ইল্লাবি হুজুরিল ক্বাল্‌বি'। অর্থাৎ : হুজুরি দিল ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হয় না। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, যে তার পালনকর্তার সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখে, তার উচিৎ সে যেন নেককাজ করে এবং তার সৃষ্টিকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে।

যেমন, 'ফামান কানা ইয়ারজু লি-কৃয়া রাব্বিহি ফাল ইয়ামাল আমালান সলেহান অলা ইউস্‌রেক বি-ইবাদাতি রাব্বিহি আহাদান'।

বর্তমানে নামাজিদের নামাজের কী অবস্থা, তা একটু চিন্তা করে দেখুন। নামাজি ব্যক্তি বলেন, নামাজে (আলহামদু) ইয়াকা-না বুদু-ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাইন'। অর্থাৎ : আমি তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। এই আয়াত যখন পাঠ করা হয়, তখন কার কথা বা রূপ ওই নামাজি ব্যক্তির ধ্যানে থাকে? প্রায়ই দেখা যায়, যে যা ভালোবাসে বা যার ভালোবাসা অন্তরে পোষণ করে, তার কথাই তখন তার ধ্যানে আসে। অথচ অন্য সময় অপেক্ষা নামাজের মধ্যেই নানা প্রকার সাংসারিক চিন্তা ও বাজে-বাহুল্য বিষয় হৃদয়ের ভিতর আরো বেশি ঘনীভূত হয়ে উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে কোন এক কবি বলেছেন–

'জাবা দর জেকরে, ওয়া দের দর ফেকরে খানা,
চে হাসেল শোদ-জী নামাজে পাঞ্জেগানা।
চে শোদ গার মসহা-ফাহ্ দর পেশে বাশোদ
চু দেল দর ফেকের গাওউ মেশে বাশোদ।'

অর্থাৎ : মুখে আল্লাহর জিকির ও মনে বাড়ি-ঘরের চিন্তা থাকলে, সে রকম পাঞ্জেগানা নামাজে তোমার কী ফল হবে? তোমার মনে যদি গরু ও মেষের ভাবনা থাকে, তবে সামনে কোরআন খুলে রাখলে কী ফল হবে?

অতএব, খোদার এবাদতে ঘোড়া, গরু, ভেড়া-বকরী, স্ত্রী-পুত্রকে গায়রুল্লাহ ভেবে আমরা বাতেনে মোশরেক হচ্ছি। এ যে কত বড় ভয়ঙ্কর ও পাপের কাজ করে চলেছি আমরা, তা বুঝতে পারছি না। এ ধরনের শেরক থেকে মুক্তির চেষ্টা করা কি আমাদের কর্তব্য নয়? সৃষ্টিকে ভুলে স্রষ্টার প্রতি গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে শুদ্ধ আত্মায় কবুলিয়াতের নামাজ আদায় করা প্রতিটি ঈমানি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য নয় কি? রাসুল (স:) সাহাবিদের, যে নামাজ শিক্ষা দিতেন, সে নামাজ ছাড়া আর কোন নামাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে কবুল হয় না। কিন্তু আমরা সে বিষয়ের বা পদ্ধতির কতটুকু মেনে নামাজ পড়ার চেষ্টা করি?

'ইন্নাল-লাহা লা-ইয়াগফির আন ইউস্‌রিকা বিহী ওয়া ইয়াগফির মাদূনা জালিকা লি-মাইয়াশা'।

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা তাঁর সঙ্গে শেরককারীকে ক্ষমা করবেন না এবং এছাড়া তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।

রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– 'আনতাবুদাল্লাহা কা-আন নাকা তারাহু ফাইল্লাম তাকূন তারাহু ফা-ইন্নাহু ইয়া রাকা'।
অর্থাৎ, তুমি এমনভাবে আল্লাহতায়ালার বন্দেগী কর, যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো। যদি তা না পার, তবে এমনভাবে আল্লাহর এবাদত কর, যেন আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।
এই হাদিস থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত নামাজেই আল্লাহর মোশাহেদা (দর্শন) করতে হবে।
হযরত আনাস (রাঃ) থেকে অন্য এক হাদিস শরীফে রেওয়ায়েত আছে– 'ইন্নাল মোকমিনূনা ইজা-কানা ফিস্ সালাতি ফা-ইন্নামা ইউসাব্বি রাব্বাহু।'
অর্থাৎ, নিশ্চয় মমিন ব্যক্তি নামাজের মধ্যে তার পালনকর্তার সঙ্গে কথোপকথন করে থাকেন।
হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যে রায় দিয়েছেন– নামাজের প্রথম তাকবিরের সময় আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ হলেই নামাজ হয়ে যাবে। এর অর্থ এই নয় যে, নামাজের অন্য অংশে আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ করতে হবে না। বরং এ কথার মর্মে বোঝা যায় যে, নামাজের সব অংশেই আল্লাহকে স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু কেউ যদি কোন ওজরবশত তাতে অক্ষম হয়, তবে প্রথম তকবিরে আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ করলেও তার নামাজ হয়ে যাবে। এটা তিনি নাচারী অবস্থায় মত দিয়েছেন। তাই বলে, তিনি এটা বলেননি যে, তোমরা জীবনভর ওইভাবে নামাজ পড়ো।
পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারাহ্ ২০৮ নাম্বার আয়াতে আছে– 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানুদ খুলু ফিসসিলমি কা-ফ্ফাহ্, অলা-তাত্তাবিউ খুতু ওয়াতিশ শাইত্বোয়ান ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন।'
অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর, আর শয়তানের (কুমন্ত্রণাদানকারীর) পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

মহাপবিত্র ওরছ শরীফের তাৎপর্য

'ওরছ বুযুর্গ ইয়া মুর্শিদিকী ছালানা ফাতেহাকী মজলিশ জুতারিখী ওফাতকো হুয়া কারতিহে'

অর্থ : ওরছ বুযুর্গাণে দ্বীন, অর্থাৎ পীর-মুর্শিদগণের সালানা ফাতেহার অনুষ্ঠান, যে তারিখে তারা ইন্তেকালপ্রাপ্ত হন।

উর্দু-ফার্সি অভিধান 'ফিরোজুল্লুগাতে' ওরছ শব্দের হাকিকী ও মাজাজী অর্থের বর্ণনায় লেখা হয়েছে :

'ওরছ বুযুর্গ ইয়া মুর্শিদিকী ছালানা ফাতেহাকী মজলিশ জুতারিখী ওফাতকো ছাদিকী দাওয়াত ত্বয়ামে ওলীমা জামে আরসু' ('ফিরোজুল্লুগাত')

অর্থাৎ, ওরছ-অর্থ : (১) কোন বুযুর্গ অথবা পীর-মুর্শিদের ইন্তেকালে সালানার তারিখ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ফাতেহাখানির অনুষ্ঠান। (২) বিবাহের দাওয়াত, ওলিমার খানা, বহুবচন আ'রুসু।

Anniversary in memory of a saint. অর্থাৎ, কোন সুফি-সাধকের ইন্তেকাল বার্ষিকীর স্মরণে অনুষ্ঠেয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ওরছ বলে। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে' ওরছ শব্দের নিম্নোক্ত অর্থ লেখা আছে– অলি-দরবেশদের বেছালাতে তাঁদের সমাধিস্থলে পবিত্র অনুষ্ঠান বিশেষ।

'নুমু কানাউমাতিল উরুসিল্লাজি লা-ইউকিজুহু ইল্লা আহাব্বু আহলিহি এলাইহি'

অর্থাৎ (কবরে নেক্কার ছালেহীন ব্যক্তিকে বলা হয়) তুমি এখানে বাসরঘরের দুলহার মতো পরমানন্দে ঘুমাতে থাক, যার ঘুম তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত অন্য আর কেউ ভাঙ্গতে পারে না। (তিরমিজী শরীফ ও মেশকাত শরীফ), ১ম খণ্ড ৯৭ পৃঃ দ্রঃ।

ওই হাদিস শরীফের মিছদাক হিসাবে ওরছ শব্দকে মানবকূলে শরয়ী বলে গ্রহণ করা যায়। হাদিস শরীফে উল্লেখিত এই ওরছ শব্দের গুরুত্ব ও তাৎপর্য গ্রহণ করেই সুফিগণ আল্লাহর অলিগণের ইন্তেকাল দিবসকে ইয়াউমুল ওরছ বা ওরছ শরীফ নামকরণ করেছেন। কারণ ইন্তেকালের এই দিনে মিলনাকাঙ্ক্ষী আল্লাহর অলিগণ মাহবুবে হাকিকী অর্থাৎ, প্রকৃত বন্ধুর একান্ত দীদার লাভ করে আকাঙ্ক্ষিত মিলনের পরমানন্দে বিভোর হয়ে যান। হাদিস শরীফে আল্লাহর অলিগণের পরম সুখকর এই আত্মিক অবস্থাকে আপেক্ষিক অর্থে বাসরঘরের দুলহার সঙ্গে পরম প্রশান্তিময় সুখনিদ্রার তুলনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, যে সুখনিদ্রা হতে তাকে শুধু তার প্রিয়তমই জাগাতে পারে, অন্য কেউ নয়। এখানে সুখনিদ্রা বোঝাতে পবিত্র আত্মাসমূহের পারলৌকিক চির পরিতৃপ্ত জীবনের কথা বলা হয়েছে, যা ভঙ্গ করার অধিকার অন্য কারো নাই।

সুবিখ্যাত 'জা'আল হক' কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ড ১৪৪ পৃষ্ঠায় ওরছ শব্দের উৎপত্তি এই মানকূলে শরয়ীর ব্যাখ্যায় লিখেছেন- উ-রুছের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শাদী। এ জন্যই বর-কনেকে আরবি ভাষায় ওরছ বলা হয়। বুযুর্গানে দ্বীনের ইন্তেকাল দিবসকে এজন্যই ওরছ বলা হয় যে, মিশকাত শরীফে 'ইছবাতি আযাবিল কবরী' শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, যখন মুনকার-নাকির মাইয়্যাতের পরীক্ষা নেয় এবং যখন সে সেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়, তখন তাকে বলেন– 'নুমু কানাউমাতিল উরুসিল্লাজি লা-ইউকিজুহু ইল্লা আহাব্বু আহলিহি এলাইহি।' আপনি সেই কনের মত শুয়ে পড়ুন, যাকে তার প্রিয়জন ছাড়া আর কেউ জাগাতে পারে না।

তাই মুনকার-নাকির ফিরিশতাদ্বয় যেহেতু ঐ দিনকে উ-রুস বলেন, সেহেতু ওরছ বলা হয়। অথবা এজন্য যে, ঐ দিন জামালে মুস্তফা (স.) কে দেখার দিন। মুনকার-নাকির

হুযুর (স.) কে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, ওনার সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? তিনিই তো সৃষ্টি জগতের দুলহা, সারাজগৎ তার-ই স্পর্শের প্রতিফলন। সেই মহান আল্লাহতায়া'লার সাক্ষাতের দিন নিশ্চয়ই ওরছের দিন। এজন্য এই দিনকে ওরছ বলা হয়। (আস্তা মাআ'মান আহব্বাবতা।) অর্থাৎ, তুমি যাকে ভালোবাস আখিরাতে তুমি তার-ই সঙ্গে থাকিবে। হাদিস শরীফের এই সূত্র অনুযায়ী আল্লাহর অলিগণ যখন নশ্বর ভুবন ছেড়ে অবিনশ্বর ভুবনে গমন করেন, তখন তা মাহবুবে হাকিকী অর্থাৎ, প্রকৃত বন্ধুর সঙ্গে চিরায়ত মিলন কক্ষে মিলিত হন। হাদিস শরীফে প্রেমাস্পদের দিকে প্রেমিকের এই মিলনমুখী অভিযাত্রার বিষয় বলা হয়েছে। 'মৃত্যু সেতুতুল্য, বন্ধুকে বন্ধুর সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া দেয়"। (মকতুবাত শরীফ, ১ম খণ্ড, ১ম পৃষ্ঠা দ্রঃ)।

উল্লিখিত হাদিসসমূহে এবং আয়াতে কারিমায় আল্লাহর অলিদের ইন্তেকালের দিনকে পরম বন্ধুর সঙ্গে তাদের মিলনের দিন বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে। তাদের জন্য ইন্তেকালের দিনটি হয় পরম সান্ত্বনার, পরম তৃপ্তির এবং পরম সুখের।

মেছবাহুল লোগাতে 'ওরছ শব্দের হাকিকী অর্থকে আনন্দে বা খুশিতে আল্লাহতায়া'লার সঙ্গে মহামিলন বলা হয়েছে। সুতরাং আউলিয়া-কেরামের ইন্তেকালের দিনকে "ইয়াউমুল ওরছ ' বা 'ওরছ শরীফ' নামকরণ করার সঙ্গে পবিত্র কোরআন, হাদিস এবং আভিধানিক (হাকিকী ও মাজাজী) অর্থের কোথাও কোন অসামঞ্জস্য বা বিরোধ নাই।

'ওরছ শরীফ' নামকরণের হাদিসানুগ অন্য একটি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আউলিয়া কেরামের আরওয়াহপাকের হুজুরে ছোওয়াব রেছানী বা ফাতেহাখানির অনুষ্ঠানকে এজন্যই সুফিগণ ওরছ শরীফ নামকরণ করেছেন যে, বিভিন্ন হাদিস শরীফের বর্ণনায় ইছালে ছওয়াব বা ছওয়াব রেছানীর অনুষ্ঠানকে আত্মার জন্য পরম খুশির বা আনন্দদায়ক বলা হয়েছে। যেমন, হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে: আত্মীয়ের নিকট হতে উপহার স্বরূপ কোন দান বা দোয়া যখন কোন ইন্তেকাল প্রাপ্ত ব্যক্তির রুহে পৌঁছে, তখন সে এরূপ আনন্দিত হয় যেমন জীবিত ব্যক্তি উপহার পেয়ে আনন্দিত হয়ে থাকে। (এহ্য়াউল উলুম দ্রষ্টব্য)। বায়হাকী শরীফে বর্ণিত অনুরূপ একটি হাদিসে বলা হয়েছে– 'নিমু কানাউমাতিল উরসীল লাজি লা-ইউক্বিজাহু ইল্লা আহাব্বু আহলিহি ইলাইহি।' অর্থাৎ- 'অতঃপর কবরবাসী ব্যক্তি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি অথবা বন্ধু-বান্ধবদের নিকট থেকে দোয়া কামনা করে। তদাবস্থায় যদি কেহ তার জন্য দোয়া করে, তবে সে এত অধিক খুশি হয় যে, জীবিতাবস্থায় সমস্ত দুনিয়া উপহার হিসাবে পাইলেও সে এতো খুশি হত না।

যেহেতু ওরছ শব্দের আভিধানিক এক অর্থ খুশি বা আনন্দ, (মেছবাহুল লোগাত দ্রষ্টব্য) সে হেতু আত্মার জন্য আনন্দদায়ক ছোয়াব-রেছানীর এই অনুষ্ঠানকে 'ওরছ' নামকরণ করার মধ্যে কোন ভ্রান্তি বা অসামঞ্জস্যতা নাই। আমরা আহলে সুন্নাত যখন আল্লাহর অলির নামে ওরছ অনুষ্ঠান করে থাকি। তখন আল্লাহর অলির ছোয়াব-নজর পেয়ে খুবই খুশি হন এবং দোয়া করে থাকেন। এই আত্মিক খুশি বা সন্তুষ্টির কারণে, আহলে সুন্নাত এই মহান ছোয়াব-রেছানীর অনুষ্ঠানের নাম ওরছ রেখেছেন। ওরছ আহলে সুন্নাতের এছ্তেলাহ্ বা খাস ভাষা।

শানে রেসালাত ও বেলায়েতের কিছু প্রমাণ

আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রাঃ) আম্মাজান আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত- হারিস ইবনে হিমাশ (রাঃ), রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনার নিকট অহি কীভাবে আসে? রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কখন তা ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় আমার নিকট আসে। আর এটাই আমার নিকট সবচাইতে কষ্টদায়ক হয় এবং তা সমাপ্ত হতেই ফেরেশতা যা বলেন, আমি তা মুখস্থ করে নেই, আবার কখনো ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে আমার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্ত করে ফেলি।

আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি সর্বপ্রথম যে অহি আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরুপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন, তা একেবারে ভোরের আলোর মতো প্রকাশ পেত। তারঃপর তার কাছে প্রিয় হয়ে পড়ে নির্জনতা এবং তিনি 'হেরা গুহায়' নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এইভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। তারপর মা খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) এর কাছে ফিরে এসে আবার অনুরূপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এমনইভাবে হেরাগুহায় অবস্থানকালে একদিন তার কাছে অহি এলো। তার কাছে ফেরেশতা এসে বললেন, পড়ুন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন– আমি তো পড়তে জানি না। তারপর তিনি তাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হল। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন– পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন– পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন– পড়ুন। আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পড়ুন আপনার রব মহা-মহিমান্বিত।

তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিল। তিনি মা খাদিজার কাছে এসে বললেন– আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। তখন তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হল। অবশেষে তাঁর ভয় দূর হল। যখন তিনি মা খাদিজা (রাঃ)-এর কাছে সব ঘটনা জানিয়ে বললেন– আমি আমার নিজের ওপর আশঙ্কা করছি। মা খাদিজা বললেন– আল্লাহর কসম তা কখনো হবে না। আপনি তো আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছেন। অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেছেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেছেন, মেহমানদেরকে মেহমানদারী করেছেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেছেন।

এরপর তাকে নিয়ে আম্মাজান খাদিজা (রাঃ)-এর চাচাতো বড় ভাই ওয়ারাকা ইবন নওফিল ইবন আবদুল আসাদ ইবন আবদুল উযযার কাছে নিয়ে গেলেন, যিনি জাহিলি যুগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষা লিখতে জানতেন এবং আল্লাহর তওফিক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইন্‌জিল কিতাব থেকে অনুবাদ করতে পারতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদিজা (রাঃ) তাঁকে বললেন– হে চাচাতো বড় ভাই আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।

ওয়ারাকা রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমাকে সহযোগিতা করতাম। তুমি কী দেখ? তখন রাসুলুল্লাহ যা দেখলেন সবই তাঁর কাছে খুলে বললেন। তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন– তিনি সেই দূত যাঁকে আল্লাহ মুসা (আঃ)-এর কাছে পাঠিয়েছেন। আফসোস, আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস, আফসোস আমি

যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে। তিনি বললেন– হ্যাঁ অতীতে যিনিই তোমার মত কিছু নিয়ে এসেছিল, তার সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব। এর কিছু দিন পরই ওয়ারাকা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। আর অহি স্থগিত থাকে।

'ওয়ালা তাকুলূ লিমাই ইয়ুক্বতালূ ফী সাবীলিল্লাহি আম্ওয়া ত বাল্ আহ্ইয়া উওঁ-ওয়ালা কিল্লা তাশ্উরুন।' (সূরা বাক্বারা, আয়াত- ১৫৪)

অর্থ: যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, তাদেরকে মৃত মনে কর না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বোঝ না।

'ওয়ালা তাহ্সা বান্নালা লাযীনা কুতিলূ ফী সাবীলিল্লাহি আমওয়া তা বাল আহ্ইয়া উন ইন্দা রাব্বীহিম ইউর্যাকুন' (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত-১৬৯)।

অর্থ: যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছেন তাদেরকে মৃত মনে কর না বরং তারা জীবিত, স্বীয় রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত, স্বীয় রবের পক্ষ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত।

'ক্বুল্-লা আস্আলুকুম আলাইহি আজ্বরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কোরবা' (সূরা শূরা, আয়াত-২৩)।

অর্থ: হে আমার মাহবুব, আপনি বলে দিন রিসালাত পৌঁছে দেয়ার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কিছুই চাই না। তোমরা শুধু আমার আহলে বাইয়াতকে ভালোবাস।' নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আমার আহলে বাইতের উদাহরণ হযরত নূহ্ (আঃ)-এর কিস্তির মত, যারা এই কিস্তিতে উঠেছিল, তারাই নাযাত পেয়েছিল। (তিরমিজি, মুসলীম শরীফ)

'ক্বুল ইন্কুন্তুম তুহিব্বুনাল্লা-হা ফাত্তাবি উ-নী ইউহবিব্ কুমুলুল্লাহ্ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম, ওয়াল্লাহু গাফুরুর রাহীম।' (সূরা : আল-ইমরান, আয়াত-৩১)

অর্থ : হে প্রিয় হাবীব (সঃ) বলুন, তোমরা আল্লাহকে পেতে চাইলে আমাকে ভালোবাস, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং ক্ষমা করবেন তোমাদের গুনাহ্। আল্লাহ ক্ষমাকারী ও অতি দয়ালু।

'ওয়ামা আরসালনা মির রাসুলিন ইল্লা লিয়ুত্বা-আ বি-ইযনিল্লাহি ওয়া লাও আন্নাহুম ইযজালামু আন-ফুসাহুম জাউকা ফাসতাগফারুল্লাহা- ওয়াসতাগ্বফারা লা-হুমুর রাসুলু লাওয়াজাদুল্লাহা তাও-ওয়াবার রাহীমা' (সূরা নিসা, আয়াত-৬৪)।

অর্থ: হে ঈমানদারগণ, প্রিয় হাবীব রাসুল (সঃ)-কে প্রেরণ করেছি এই জন্য যে, তোমরা তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করবে। প্রিয় হাবিব (সঃ), তারা যদি তাদের অপরাধকৃত কর্মের জন্য আপনার কাছে এসে আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় এবং আপনি যদি তাদের জন্য সুপারিশ করেন, তাহলে আমি ক্ষমা করে দিই। আল্লাহ অতি দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

'ওয়া-লাক্বাদ কাতাবনা-ফিয্যাবূরি মীম বা' দিয্যিকরি আন্নাল আরদ্বা-ইয়ারিসূহা-ইবা-দিয়াস-ছলীহুন।'

(সূরা আমবিয়া, আয়াত-১০৫)।

অর্থ: প্রিয় হাবীব (সঃ) নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, আপনার মহব্বতে আমার মাহবুব আমার বন্ধু অলি-আউলিয়াদেরকে পৃথিবীর স্বত্তাধিকারী করে, তা আমার লওহে মাহফুজে লিখে রেখেছি।

কামেল মুর্শিদ বা পীরের কাছে যাওয়ার অকাট্য দলিল

কিছু কিছু মানুষের ভুল ধারণা, তারা কথায় কথায় বলে থাকে– 'মা-বাবা জীবিত থাকলে পীরের কাছে যাওয়ার দরকার নাই। তাদের অযৌক্তিক কথা খণ্ডনের জন্য আমি একটি হাদিস তুলে ধরলাম– 'উত্লুবুল ইল্মা ওয়ালাউ কানা ফিচ্চীন'। অর্থ: রাসুলেপাক (সঃ) এরশাদ করেছেন– জ্ঞান অর্জন করার জন্য সুদূর চীন দেশে যেতে হলেও যাও, তবু এলেম হাসিল করো। তদ্রূপ কামেল পীর-আউলিয়াদের দরবারও এলমে মারেফত বা তাসাউফ শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে পীরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে, নিজেকে চেনা-জানার মত ও পথে আমলের দ্বারা আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ করাই পীর-আউলিয়াদের দরবারে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য।

সূরা মায়িদা, ৪৮ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'লিকুল্লিন্ জ্বাআল্না মিন্কুম শিরআতাওঁ ওয়ামিন্হাজ্বা'। অর্থ: আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য দুইটি পথ দিয়েছি, একটি হলো শরিয়তের পথ অপরটি হলো মারেফতের পথ'। ইমাম আজম আবু হানি-ফা (রহ.) বলেন– শরিয়তের এলমের দ্বারা শরীরের বাহিরের দিক অর্থাৎ জাহেরকে দুরস্থ করে এবং এলমে মারেফতের দ্বারা শরীরের ভিতরকে পাকপবিত্র করে।

সূরা কাহাফ, ১৭ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'ওয়ামাই ইয়ুদ্বলিল ফালান্ তাজ্বিদালাহু ওয়ালিয়্যাম মুরশিদা'। অর্থ: তারাই হতভাগা বা গোমরাহ্, যারা কামেল মুর্শিদ বা পীরের সান্নিধ্যে গেল না এবং ছোহবত লাভ করল না। হক্কানী পীরকামেলের সান্নিধ্যে না গেলে, আল্লাহতায়ালা তাদেরকে পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ্ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সূরা তওবাহ্, ১১৯ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজ্বিনা আমানুত্-তাকুল্লাহা ওয়াকূনূ মাআছ্ ছোয়া-দিক্বীন'। অর্থ: হে ঈমানদার বিশ্বাসীগণ! তোমরা সত্যবাদিদের সঙ্গী হইয়া যাও। এই আয়াতে পীরকামেলর নিকট এবং সত্যবাদিদের কাছে যাওয়ার জন্য আল্লাহতায়ালা হুকুম করেছেন।

হে পাঠকগণ! আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন, আল্লাহর আদেশ অমান্য করিলে তার পরিণাম কী হইতে পারে। সূরা মায়িদাহ্, ৩৫ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজ্বিনা আমানুত্ তাকুল্লাহা ওয়াবতাগূ ইলাইহিল অসীলাতা ওয়াজ্বাহিদু ফি-ছাবিলিহী লা-আল্লাকুম তুফলিহুন'। অর্থ: হে ঈমানদার বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহকে পাইবার জন্য উছিলা অন্বেষণ কর। তার পথে জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার'। মশহুর তাফসিরে উছিলা দ্বারা শুদ্ধ মানুষ বা চৈতন্য গুরু ধরার কথা বলা হয়েছে, (এখানে 'চৈতন্য গুরু' দ্বারা কামেলপীর বা মুর্শিদ বোঝানো হইয়াছে)।

সূরা ফাতেহা, ৫ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'ইহ্দিনাছ্ ছিরাত'ল মুস্তাক্বীম' অর্থ: আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন'। ৬ নং আয়াত– 'ছিরা ত্বোয়াল্লাজ্বীনা আনআম্তা আলাইহিম'। অর্থ: সেই সকল মানুষের পথে, যাদেরকে আপনি নিয়ামত এবং বাতেনি চক্ষু দান করেছেন'। ৭ নং আয়াত– গাইরিল মাগদুবি আলাইহীম ওলাদ-দ্বোয়াল্লীন'। অর্থ: সেই সমস্ত মানুষের পথে নয়, যেই সমস্ত মানুষ আপনার গজবে নিপতিত এবং পথভ্রষ্ট হয়েছে'। হুজুর পুরনূর (সঃ) এরশাদ করেছেন– 'ত্বোয়ালেবুল ইল্মি ফারিদ্বাতুন্ আলা কুল্লি মুসলিমিন ওয়া মুসলিমাতিন'। অর্থ: প্রত্যেক নর-নারীর জন্য এলেম তলব করা ফরজ' (রাওয়াহুল বায়হাক্কি ওয়া ইবনে মাযহা)।

আমরা জাগতিক বা জাহেরি শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রথমেই মক্তব-মাদ্রাসা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাই স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অর্জন করে থাকি। তেমনি আল্লাহকে পাওয়া এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করার জন্য, হক্কানি কামেল পীর বা আউলিয়াদের পথ অনুসরণ করতে হয়। তাঁরা আত্মাকে এছলাহ্ বা আত্মশুদ্ধি, দিলজিন্দা ও নামাজে হুজুরী লাভের উদ্দেশ্যে হরহামেশা অজিফা-কালাম, ধ্যান-মোরাকাবার শিক্ষা দিয়ে আল্লাহতায়ালার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়ে দেন। মসনবি শরীফে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (রহ.) বলেন–

'এলমে বাতেন হামসু মছকা
এলমে জাহের হামসু শির
কায়বুওয়াদ বে শরীরে মছকা
বায় বুওয়াদ বে পীরে পীর'।

অর্থ: জাহেরী শিক্ষার জন্য যেমন একজন মাস্টার বা শিক্ষকের কাছে যেতে হয়, তেমনি আত্মাকে এছলাহ্ বা নিজেকে চেনার জন্য একজন আধ্যাত্মিক গুরু বা কামলে পীর-মুর্শিদ ধরতে হয়'। মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী আরো বলেন–

'খোদ বা খোদ কামেল না শোদ মাওলানায়ে রুম
তা গোলামে শামসে তিবরিযী না শোদ'।

অর্থ: আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মাওলানা হইতে পারি নাই, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার পীরের পায়রবী করলাম। তাই মাওলানা রুমী (রহ.) আরো বলেন–

'দর হাকিকত গাশ্তায়ি দূর আয্ খোদা
গর শুভি দুর আয্ ছোহবতে আউলিয়া'।

অর্থ: সত্যিকারে ওই ব্যক্তিই আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে দূরে আছে, যে ব্যক্তি অলি-আল্লাহর নিকট হইতে দূরে থাকে'। চার ইমামের প্রধান ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.) বলেন– 'লাওলা ছিনতানে হালাকা নোমান'। অর্থ: আমি নোমান, যদি দুই বছর আমার পীর ইমাম বাকের (রহ.)-এর গোলামী না করতাম, তবে ধ্বংস হয়ে যেতাম'। হে পাঠকগণ! এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, তিনি একজন এত বড় ইমাম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পীর ইমাম বাকের (রহ.)-এর কাছে নিজেকে একেবারেই আত্ম-বিলীন করে দিয়েছিলেন। অতএব, পীরকামেলের কাছে না গেলে আমাদের কী অবস্থা হইবে আপনারাই ভেবে দেখুন।

তুমি যদি পূর্ণ মুমিন হতে চাও শরিয়তের ছোট-বড় হুকুম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মানিয়া চল

কেউ যদি ওযু-গোসল ছাড়া, শরিয়তের কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ছাড়া, যদি কোন লোক আকাশ দিয়া উড়িয়া যায় কিংবা পানির উপর দিয়া হাঁটিয়া যায় এবং যদি দেখ মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে, তবুও তাকে অনুসরণ করিও না। কারণ তার ভিতরে শরিয়তের আমল নাই বিধায়, তার নিকট গেলে ঈমান নষ্ট হইয়া যাইবে।

পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারাহ্, ২০৮ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানুদ্ খুলু ফিসসিলমি কা-ফ্ফাহ্, অলা তাত্তাবি'উ খুত্তুওয়াতিশ শাইত্বোয়া-ন, ইন্নাহূ লাকুম্ আদুউয়্যু'ম্ মুবীন্।

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে পূর্ণভাবে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

শয়তানের প্রকারভেদ: মানুষ সুরতি শয়তান, জ্বীন শয়তান, খবিশ শয়তান, নফস্ শয়তান, আরওয়াহ্ শয়তান।

সূরা আনফাল, ২ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা আরো বলেন– 'ইন্নামাল মু'মিনুনাল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াজ্বিলাত কুলুবুহুম। অর্থ: নিশ্চয় মুমিন তারাই, যখন তাদের সামনে আল্লাহর যিকির করা হয়, তখন তাদের অন্তর কম্পিত হয়। অর্থাৎ, শরীর কাঁপিয়া ওঠে এবং এক ধরনের হাল-জয্বা হয়।

সূরা মুমিন, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'ওয়াক্বা লাল্লাযী আমানা ইয়া ক্বাওমিত তাবিউনি আহ্দিকুম সাবীলার রাশাদি। ইয়া ক্বাওমি ইন্নামা হাযিহিল হায়া-তুদ্ দুন্ইয়া মাতাউওঁ ওয়া ইন্নাল আখিরাতা হিয়া দারুল ক্বারার। মান্ আমিলা সাইয়ি আতান্ ফালা ইউজযা ইল্লা মিছ্লাহা ওয়ামান্ 'আমিলা ছালিহাম্ মিন্ যাকারিন্ আওউন্ছা ওয়া হুওয়া মু'মিনুন্ ফা-উলাইকা ইয়াদ্খুলুনাল্ জান্নাতা ইউরযাকুনা ফীহা বিগাইরি হিসাব'।

অর্থ: সে মুমিন ব্যক্তি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করব। হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী ভোগের বস্তুমাত্র এবং পরকাল হল স্থায়ী নিবাস। যে পাপ করে, তাকে সেই পাপের প্রতিফল প্রদান করা হবে এবং যে নেক কাজ করে, সে পুরুষ হোক বা নারী হোক, সে প্রবেশ করবে জান্নাতে এবং সেখানে অপরিমিত রিযিক দেয়া হবে।

হে পাঠকগণ! এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা মুমিন ব্যক্তির কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন কেন? মুমিন ব্যক্তির পথ অনুসরণ করতে বললেন কেন? যারা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন– কোন পীর-মুর্শিদের কাছে যাওয়ার দরকার নাই। অথচ আল্লাহতায়ালা সূরা মুমিন, আয়াত-৩৮, ৩৯ ও ৪০ নম্বরে মুমিন ব্যক্তি বা কামেল মুর্শিদের কাছে যাওয়ার কথা বলেছেন। সুতরাং পীরকামেল মুর্শিদই মুমিন। মুমিন ব্যক্তি কাবার চাইতেও অধিক সম্মানিত (ইবনে মাজাহ্)।

সূরা মায়িদাহ্, আয়াত ৪৮ 'লিকুল্লিন্ জ্বা'আল্না মিন্কুম্ শিরআতাওঁ ওয়া মিন্হাজ্বা'।

অর্থ: আমি তোমাদের জন্য দুটি পথ দিয়েছি। একটি শরিয়ত আরেকটি মারেফত।

এলেম দুই প্রকার। একটি জাহেরি এলেম অপরটি বাতেনি এলেম। চার ইমামের এক ইমাম মালেক (রহ.) বলেন– যে শুধু শরিয়ত পালন করলো, মারেফত পালন করলো না সে হলো জিন্দিক বা কাফের। এবং যে শুধু মারেফত করলো শরিয়ত পালন করলো না, সে হলো ফাসেক। যে শরিয়ত ও মারেফত উভয় এলেমের ওপর আমল করে,

সে হকের মধ্যে আছে। ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.) বলেন– শরিয়তের এলেমের দ্বারা বাহিরকে দুরস্ত করে এবং এলমে মারেফতের দ্বারা ভিতরকে পবিত্র করে। তিনি আরো বলেন– আল্লাহর নৈকট্যলাভ করতে হলে শরিয়ত ও মারেফতের উভয় আমলই হাসিল করতে হবে।

সম্মানিত পাঠকগণ! আপনারাই চিন্তা করিয়া দেখুন, শরিয়ত ও মারেফতের এলেম শিক্ষা করা দরকার আছে কি না? কিছু কিছু মানুষের ধারণা, তাঁরা বলে থাকেন– পীরের কাছে মুরিদ হলে অজু-গোসল, নামাজ, রোজা লাগে না। তাঁদের করা এ সমস্ত উক্তি ভ্রান্ত আকিদা। কাজেই যারা এ সমস্ত ভ্রান্ত আকিদার শিক্ষা দেয়, তারা নিজেরাও বিপদে আছে এবং তাদের অনুসারিরাও বিপদে আছে। কারণ, এ শিক্ষা দ্বারা মানুষ গোমরাহ্ বা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। একজন কামেলপীর কোনদিন বে-শরা শিক্ষা দিতে পারেন না। তাঁরা প্রকৃত পক্ষে রাসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সুন্নতের সত্য তরিকতের আমল শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাই পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা হক্কানী কামেলপীর-মুর্শিদের নিকট যাওয়ার হুকুম করেছেন, (সূরা তওবা)। হক্কানী কামেলপীর যাঁরা, তাঁরা শরিয়তের ছোট-বড় যাবতীয় হুকুম-আহ্কাম ও তরিকতের আমল পালন করার জন্য ভক্ত-মুরিদদেরকে জোর আদেশ করেন। দুনিয়ামুখি বা আল্লাহভোলা মানুষদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে অজিফা আমল, মোরাকাবা-মোশাহাদা, আত্মশুদ্ধি, দিলজিন্দা ও নামাজে হুজুরী পয়দা করাইয়া আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থাকেন।

পবিত্র কোরআন ও হাদিসভিত্তিক আদব রক্ষা করে চলা অপরিহার্য কর্তব্য

বেয়াদব (Impertinent) আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে। বেয়াদবি, হটকারিতা পরিহার করা প্রসঙ্গে, পবিত্র কোরআনে সূরা ফোরকান, ৬৩ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'ওয়া ইবাদুর রাহ্‌মানিল-লাযীনা ইয়ামশুনা আলাল আরদ্বি হাওনা'। অর্থ: তারাই আল্লাহতায়ালার বিশিষ্ট বান্দা, যারা ভূ-পৃষ্ঠে নম্রতা ও বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে। আদব-আজিজী-এনকেছারী-বিনয়-নম্র ও ভদ্রতার ব্যাপারে সূরা লোকমানে আল্লাহতায়ালা আরো বলেন– 'ওয়ালা তুস্বা'য়্যির খাদ্দাকা লিন্নাসি ওয়ালা তাম্‌শি ফিল আরদ্বি মারাহান; ইন্নাল্লাহা লা-ইউহিব্বু কুল্লা মুখতালিন ফাখুর। ওয়াকস্বিদ ফী মাশইকা ওয়াগদুদ্ব মিন্‌-স্বাওতিকা'।

অর্থ: হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে নসিহত করে বলেন– বৎস, মানুষের দিক হইতে মুখ ফিরায়ে নিও না এবং দম্ভভরে ভূ-পৃষ্ঠে চলিও না, নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা কোন অহংকারী-দাম্ভিক বা বেয়াদবকে পছন্দ করেন না। আর নিজ চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর, নিজের কণ্ঠস্বর নিচু কর। সূরা লোকমান, আয়াত ১৮ ও ১৯। আল্লাহতায়ালা ওয়াদা করেছেন, যে ব্যক্তি আদব, নম্রতা-ভদ্রতা অবলম্বন করিবে তাকে আল্লাহতায়ালা উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। এছাড়া বিনয়-ভদ্রতা হচ্ছে ঐক্যের মূলমন্ত্র। যে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিনয় ও নম্রতা থাকবে, তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হতে পারে না। আনফাসে ঈমান নম্রতার মধ্যে আকর্ষণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। নম্র ও ভদ্রলোকের প্রতি মানুষের মহব্বত সৃষ্টি হয়।

সূরা হুজ্‌রাত, ১ ও ২ নং আয়াতে আদবের ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'ইয়া আইয়্যুহাল লাযীনা আমানু লা-তুকাদ্দিমু বাইনা ইয়াদায়িল্লাহি ওয়া রাসুলিহি ওয়াত্তা কুল্লাহা ইন্নাল্লাহা সামীউন্‌ আলীম। ইয়া আইয়্যুহাল লাযীনা আমানু লা-তারফাউ আস্বওয়া-তাকুম্‌ ফাওকা ছাওতিন নাবিয়্যি ওয়ালা তুযাহারু লাহু বিলক্বাওলি কাজ্বাহরি বা'দ্বিকুম লিবা'দ্বিন আন তাহ্‌বাত্বা 'আমালুকুম ওয়াআনতুম লা-তাশ্‌'উরূন।

অর্থ: আল্লাহতায়লা বলেন– হে বিশ্বাসীগণ! রাসুলের সামনে অগ্রগামী হইও না, আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে নিজেদের কণ্ঠ উঁচু করিও না। কেননা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করা বা বড় করা চরম বেয়াদবি। বেয়াদবকে কখনও আল্লাহ পছন্দ করেন না'।

আদবের সাথে চলা সম্পর্কে হাদিস থেকে দলিল দেয়া হলে, নবী করিম (সঃ) বলেছেন– 'মান্‌ লা আদাবা লাহু ফালা ঈমানা লাহু ওয়া লা তাওহীদা ওয়াশ শরীয়তা লাহু'। অর্থ: যার আদব নাই তার ঈমান ও তাওহীদ নাই, যার আদব নাই, তার শরিয়তও নাই' (আল হাদিস)। যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহতায়ালা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। আদবের ব্যাপারে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (রহ.) তাঁর রচিত গ্রন্থ 'মসনবি শরীফে' উল্লেখ করেন যে– 'আয় খোদা জুইয়াম তাওফীকে আদব, বে-আদব মাহরুম গাশত আয ফজলে রব।' অর্থ: হে খোদা তুমি দয়া করে আমাকে আদব ভিক্ষা দাও। কেননা বেয়াদব আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত থাকে। হযরত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী আরো বলেন–

'বে-আদব বা তা খোদরা দাশতে বদ
বালকে আতেশ দারহামা আফাক যাক'।

অর্থ: বেয়াদব শুধু নিজেকেই ক্ষতি করে না বরং সে পৃথিবীতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

পবিত্র কোরআনে আউলিয়া কেরামগণের মর্যাদা

(১) অলাতাক্বূলু লিমাই ইয়ুক্বতালু ফী সাবীলিল্লাহি আমওয়াত, বাল আহ্ইয়া য়ুঁও অলাকিল্লা তাশ্উরূন। (সূরা আল বাক্বারা-২-১৫৪)
অর্থ: যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে, তাদেরকে মৃত মনে কর না বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা বোঝ না, খবর রাখ না।
(২) অলা-তাহ্সাবান্নাল্লাযীনা ক্বুতিলূ ফী সাবীলিল্লা-হি আম্ওয়াতা- বাল্ আহ্ইয়া-উন্ ইন্দা রাব্বিহিম্ ইয়ুরযাক্বুন্। (সূরা আলে ইমরান-আয়াত-১৬৯)
অর্থ: যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে তাদেরকে মৃত মনে কর না। তারা বরং জীবিত, স্বীয় রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত, স্বীয় রবের পক্ষ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত।
(৩) অমাইঁ ইয়ুত্বিই'ল লা-হা অর্রাসূলা ফাউলা-য়িকা মা'আল্লাযীনা আন্'আমাল্লা-হু আলাইহিম্ মিনান্না- বিয়্যীনা অছ্ছিদ্দিক্বীনা অশ্শুহাদা-য়ি অছ্ছোয়া লিহীনা অ হাসুনা উলা-য়িকা রফীক্বা' (সূরা নেছা, আয়াত-৬৯)।
অর্থ: সত্যবাদি, শহীদ সিদ্দিকগণ আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-এর আশেক, তারা বেহেশতে নবী (সঃ)-এর সঙ্গী হবেন। তাঁরা কতই না সুন্দর।
হযরত আলী (রাঃ) এরশাদ করেন যে– 'আমার অন্তরে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্তানাদি, মাতা-পিতা এমনকি শীতল পানি অপেক্ষাও নবী করিম (সঃ)-এর ভালোবাসা অধিক প্রিয়' (হাদিস- মাদারেজুন নবুয়্যত)। নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোন মৃত্যু নাই বরং তাঁরা স্থানান্তরিত হয়, ধ্বংসশীল ইহজগত থেকে পরজগতে' (আল হাদিস)। নিশ্চয়ই আমার বন্ধুগণ আমার জুব্বার অন্তরালে অবস্থান করেন। আমি এবং আমার আউলিয়াগণ ব্যতীত তাঁদের পরিচয় সম্বন্ধে কেহই অবগত নয়, (আল হাদিস)।

মহান আল্লাহর কাছে হযরত আদম (আঃ) অতি সম্মানিত

পবিত্র কোরআনের বাণী– 'ওয়া ইয্ ক্বুলনা লিল মালা-ইকাতিস জুদূ লিআ-দামা ফাসাজ্বাদূ ইল্লা ইব্লিস; আবা ওয়াস্তাকবারা ওয়া ক্বা-না মিনাল কা-ফিরীন'। অর্থ: আমি যখন সমস্ত ফেরেশতাদের আদেশ করলাম, তোমরা সকলে আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলিশ ব্যতীত সকল ফেরেশতা সেজদা করল। সে (ইবলিশ) আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করল। সুতরাং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল। (সূরা আল বাকারাহ্, আয়াত-৩৪)। মাতা-পিতা, ওস্তাদ-গুরু-পীর-মুর্শিদকে ভক্তি করা, শ্রদ্ধা করা, তাজিম করাকে সমাজে কিছু সংখ্যক মানুষ সমালোচনা করে থাকে। তাদের ধারণা হলো, এসব গুনাহ্ের কাজ এবং 'বেদাত' বলিয়া থাকে। এই ভক্তি-শ্রদ্ধার মর্মার্থ যদি তারা জানতো এবং বুঝতে পারতো, তাহলে তারা সমালোচনা করতো না, নিন্দাও করতো না।

হে পাঠকগণ! আপনারাই বিবেচনা বা চিন্তা করিয়া দেখুন, যারা এ সমস্ত নেক কাজকে অস্বীকার করে, কোরআন-হাদিসকে অস্বীকার করে এবং তারা নিজেরাও তা আমল করে না, অন্যকেও আমল করতে বাধা প্রদান করে থাকে তারা কতই না বড়পাপী। সূরা নামল-এর ৩৮, ৩৯ ও ৪০ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'ক্বা-লা ইয়া- আইয়্যুহাল মালাউ আইয়্যুকুম ইয়াতীনী বি আরশিহা ক্বাবলা আই ইয়া তূনী মুসলিমীন'। অর্থ: হে আমার পরিষদবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে রানী বিলকিস আসার আগে তাহার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসতে পার? (আয়াত-৩৮)।

'ক্বা-লা ইফরীতুম মিনাল জ্বিন্নি আনা আ-তীকা বিহী ক্বাবলা আন তাকুমা মিম ম্াক্বা মিক, ওয়া ইন্নী আলাইহি লাক্বাওওয়য়্যিন আযীয'। অর্থ: ইফ্রীত নামক মহাশক্তিশালী এক জিন বললো, আমি সিংহাসন আপনার সম্মুখে কিছু সময়ের মধ্যে আনিতে পারিব এবং আমি সিংহাসন আনার মতো ক্ষমতাবান, (আয়াত- ৩৯)। 'ক্বা-লাল্লাযী ইন্দাহূ ইলমুম মিনাল কিতাবি আনা আ-তীকা বিহী ক্বাবলা আই ইয়ারতাদ্দা ইলাইকা ত্বারফুক'। অর্থ: হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দরবারে এক বুর্জুগ ব্যক্তি (আসিফ ইবনে বারখিয়া), যার মধ্যে লওহে মাহফুজ-এর এলেম ছিল এবং তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি বললেন, আমি (বিলকিস রানীর) সিংহাসন আনিয়া দিব। আপনি চক্ষু বন্ধ করবেন, খুলিয়া দেখবেন সিংহাসন আসিয়া গেছে, (আয়াত-৪০)। মানুষের মধ্যে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা অসাধারণ, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ও দিদারপ্রাপ্ত। তারা আল্লাহকে চিনেন এবং আল্লাহতায়ালাও তাদেরকে চিনেন, তারা যদি আল্লাহর কাছে কারো জন্য কিছু দাবি করে বসেন বা চান, আল্লাহ তাতে রাজি হইয়া যান, ইহা সূরা নামল দ্বারা প্রমাণিত।

হে পাঠকগণ! আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, আল্লাহতায়ালা যাদের পছন্দ করেন, তাদের এলমে লাদুন্নী ও আসমানী জ্ঞানের দ্বারা অনেক অলৌকিক ক্ষমতা দান করেন, যাহার মাধ্যমে তারা অনেক অসাধ্য কাজ সাধন করিয়া থাকেন। যাহা সূরা নামলের মধ্যে প্রমাণ পাওয়া গেল, পবিত্র কোরআনের এই হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।

নামাজে হুজুরীদিল ছাড়া কেহ আল্লাহর নৈকট্য বা দিদার লাভ করিতে পারিবে না

আল্লাহতায়ালা বান্দাদের ওপর তাওহীদের পর নামাজ হইতে অধিক প্রিয় আর কোন জিনিস ফরজ করেন নাই। পবিত্র কোরআনের সূরা আন্‌কাবূত-এর ৪৫ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'ওয়া আক্বিমুস্ স্বালা-তা ইন্নাস্ব স্বালা-তা তান্‌হা আনিল্ ফাহ্‌শা ই ওয়াল্ মুন্‌কার'। অর্থ: নামাজ কায়েম কর, নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে পাপের কাজ হইতে বাঁচাইয়া রাখে'। বর্তমানে অধিকাংশ নামাজীদেরই কী রকম অবস্থা তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখুন। অনেক নামাজী নামাজ পড়ে আবার তারা ঘুষ গ্রহণ করে, রেশওয়াত, মিথ্যা, ধোঁকাবাজী করে, পরকে ঠকায় এসব গুনাহ্ কবিরা ও গুনাহ্ ছগিরা। মোট কথা যতপ্রকার গুনাহ্ আছে এর সবই অনেক নামাজীগণ করিতেছে, কোনরকম গুনাহ্ই নামাজী বাদ দিতেছে না। আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, নামাজ নামাজীকে কঠিন গুনাহ্র কাজ হইতে বাঁচাইয়া রাখে। কিন্তু এখন নামাজ যে গুনাহ্র কাজ হইতে বাঁচাইয়া রাখে না, ইহার কারণ কী? তবে কি আল্লাহতায়ালা মিথ্যা কথা বলিয়াছেন? (নাউজুবিল্লাহ)। আমরা মূলে নামাজই পড়িতেছি না, আল্লাহতায়ালা কখনো অসত্য বলিতে পারেন না বরং আমরা হাকিকতে নামাজই পড়িতেছি না। আমরা অধিকাংশই কেবল সমাজ রক্ষা করিয়া আসিতেছি। এই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত (নামাজ) আমরা কীভাবে সম্পূর্ণ করিয়া থাকি, তাহা নিজে নিজে গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন। দায় ঠেকাভাবে কি আমরা এই নামাজ পড়ি না! মাথার বোঝা নামাইয়া ফেলার মত কি আমরা নামাজ আদায় করি না? লোক-লজ্জার ভয়ে, সমাজের ভয়ে, গুরুজনের ভয়ে কি আমাদের অনেকের নামাজ পড়া হয় না? তবে কী করিয়া সে নামাজ আমাদিগকে নানা প্রকার গুনাহ্র কাজ হইতে বাঁচাইবে? নামাজে হুজুরীদিল না হইলে পুরুষ ও মেয়েলোক কাহারও নামাজ শুদ্ধ হইবে না। অর্থাৎ, নামাজের মধ্যে মন সর্বদা খোদার ধ্যানে একাগ্র না হইলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। কেননা, সহিহ্ হাদিসে বর্ণিত আছে– 'লা ছালাতা ইল্লা বিহুজুরীল ক্বালব'। অর্থ: হুজুরীদিল ব্যতীত নামাজ শুদ্ধ হয় না'। মনে সর্বদা খোদাতায়ালার ধ্যান থাকা ও তাহার প্রেম-ভালোবাসা ব্যতীত নামাজ শুদ্ধ হয় না। আল্লাহতায়ালা কোরআন শরীফে আরেক স্থানে ফরমাইয়াছেন– 'ফামান কানা ইয়ারজু লিক্বা আ রাববিহী ফাল্ ইয়া' মাল্ স্বা-লিহাও ওয়ালা- ইউশরিক বি ইবা-দাতি রাববিহী আহাদা'। অর্থ: যে ব্যক্তি তাহার পালনকর্তার সহিত সাক্ষাৎ ও তাহার দিদারের আশা রাখে, তাহার উচিৎ যে, সে যেন নেক কাজ করে ও তাহার পালনকর্তার ইবাদতে কাহাকেও শরিক না করে' (সূরা কাহাফ, আয়াত– ১১০)। বর্তমানে নামাজীদের নামাজের কী অবস্থা তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখুন। আমরা সূরা ফাতেহা (আলহামদু)তে যখন পাঠ করি, 'ইয়্যাকা না-বুদু ওয়াই-য়্যাকা নাস্তাইন' (অর্থ: আমি তোমারই বন্দেগী করি ও তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি), পড়ি তখন কাহার কথা বা কাহার রূপ ধ্যানে থাকে এবং এই কথা কাহাকে বলা হয়। প্রায়ই দেখা যায়, যে যাহা ভালোবাসে বা যাহার চিন্তা দিলে পোষণ করে, তাহার কথাই তখন তাহার ধ্যানে আসে। বরং অন্য সময় অপেক্ষা নামাজের মধ্যেই নানা প্রকার সাংসারিক চিন্তা ও বাজে বাহুল্য বিষয় হৃদয়ের ভিতরে আরও বহুগুণে বেশি ঘনীভূত হইয়া উপস্থিত হয়। এমনকি অনেক সময় নামাজের রুকু, সেজদা, তসবিহ্ ও বৈঠক রীতিমত হয় না। এই প্রকার ভুল ও বেখেয়ালী নামাজীকে শাস্তির সংবাদ দিয়া আল্লাহতায়ালা (সূরা মা'উন-এর ৪, ৫ ও ৬ নং আয়াত) ফরমাইয়াছেন– 'ফাওয়াইলুল লিল মুস্বাল্লীন'।

'আল্লাযীনা হুম আন স্বালা তিহিম সা-হূন'। 'আল্লাযীনা হুম ইউরা- ঊন'। অর্থ: যে মুসল্লি (গায়ের-আল্লাহর চিন্তায়) নামাজে ভুল করে, তাহার জন্য দোজখের ঐ স্থান যাহার নাম 'ওয়ায়েল' এবং তাহার জন্য যে 'রিয়া' (লোককে দেখানোর জন্য এবাদত) করে। হযরত নবী করীম (সঃ) ফরমাইয়াছেন– 'সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চোর ঐ ব্যক্তি, যে নামাজে চুরি করে। অর্থাৎ লোককে দেখানোর জন্য নামাজ আদায় করিয়া থাকে। কোন এক কবি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন–

'জাবা দর জেকরে ওয়া দেল দর ফেকরে খানা
চে হাসেল শোদ জী নামাজে পাঞ্জে গানা।
চে শোদ গার মসহা-ফাহ্ দর পেশে বাশোদ
চু দেল দর ফেকের গাওউ মেশে বাশোদ'।

অর্থ: মুখে আল্লাহর জিকির ও হৃদয়ে বাড়ি-ঘরের চিন্তা থাকিলে, সেই প্রকার পাঞ্জেগানা নামাজে তোমার কী লাভ হইবে? তোমার মনে যদি গরু ও মেষের ভাবনা বা চিন্তা থাকে, তবে সম্মুখে কোরআন খুলিয়া রাখিলে কি ফল হইবে? অতএব, খোদার ইবাদতে ঘোড়া, গরু, ভেড়া, বকরি, স্ত্রী-পুত্রকে গায়রুল্লাহ্ ভাবিয়া আমরা বাতেনে মোশরেক হইতেছি। ইহা কত বড় ভয়ঙ্কর পাপের কাজ করিতেছি! এ সকল শিরক হইতে মুক্তির ব্যবস্থা করা কি আমাদের কর্তব্য নহে? হযরত রাসুল (সঃ) ফরমাইয়াছেন– 'এমন অনেক নামাজী আছে, তাহাদের পরিশ্রম ও ক্লান্তি ব্যতীত নামাজ হইতে আর কিছুই লাভ হয় না। ইহার কারণ এই যে, তাহারা কেবল শরীরকে কষ্ট দিয়া এবং ক্লান্ত করিয়া নামাজ পড়িয়া থাকে। অথচ তাহাদের অন্তর আল্লাহতায়ালা হইতে বহু দূরে থাকে। হযরত হাসান বস্‌রী (রহ.) বলিয়াছেন– 'যে নামাজ একাগ্রচিত্তের সহিত হয় না, সে নামাজ শাস্তির যোগ্য। অর্থাৎ যে নামাজী নামাজকে একাগ্রচিত্ততার সহিত পড়িবার জন্য চেষ্টাও করে না কিংবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়িয়া থাকে তাহার নামাজ শাস্তিযোগ্য। অন্য আর এক হাদিসে আছে, যে নামাজী স্বীয় নামাজকে বাজে কল্পনা ও নানাবিধ চিন্তা হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্ট করে না (অর্থাৎ বাজে চিন্তা হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করে না) সে আল্লাহতায়ালার দরবার হইতে বিতাড়িত হওয়া ব্যতীত উক্ত নামাজে কোন ফল পাইবে না। এখন বোধ হয় জাহেরা আলেমগণ হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাহেবের দায় দিয়া অব্যাহতি পাইতে চেষ্টা করিবেন।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাহেব যে রায় দিয়াছেন, নামাজের প্রথম তাকবিরের সময় আল্লাহতায়ালার স্মরণ হইলেই নামাজ হইয়া যাইবে। ইহার অর্থ এই নয় যে, নামাজের অন্য অংশে আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ করিতে হইবে না। বরং উহার মর্মে এ-ই বোঝা যায় যে, নামাজের সকল অংশেই আল্লাহকে স্মরণ রাখিতে হইবে। কিন্তু কেহ যদি কোন ওযরবশত উহাতে অক্ষম হয়, তবে প্রথম তকবিরে খোদাতায়ালাকে স্মরণ করিলেও তাহার নামাজ কোন রকমে আদায় হইয়া যাইবে। ইহা তিনি নাচারী অবস্থায় মত দিয়াছেন। তাই বলিয়া তিনি ইহা বলেন নাই, তোমরা জীবনভর ওইভাবেই নামাজ পড়িও। অথচ তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, কোরআন ও হাদিসের বিরুদ্ধে যদি তোমরা আমার কোন কথা দেখিতে পাও, তবে উহা বাদ দিয়া কোরআন ও হাদিস মতে আমল করিও। অনেক লোক আছে, তাহারা নিজে নিজে নামাজে হুজুরীর জন্য খুব চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু কোন কামেল অলির সাহায্য নেয় না। তাহারা বলে, নামাজে হুজুরীদিলের জন্য চেষ্টা করার হুকুম আছে। আমরা হুজুরীর জন্য চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহা সত্ত্বেও যদি হুজুরীদিল না হয়, তবে আমরা আল্লাহর হুজুরে দায়ী হইবো না। নিশ্চয়ই তাহারা হুজুরীর জন্য দায়ী হইবে। কেননা, আল্লাহতায়ালা মানুষকে পাপের সাগর হইতে মুক্ত করার জন্য সবসময় সব দেশে অলি পাঠাইয়া আসিতেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল

(সঃ) অলিদের নিকট গিয়া মানুষের আমলকে শুদ্ধ করার জন্য আদেশ করিয়াছেন। সেই অলিদের সাহায্য না নিয়া, এখন যদি নিজে নিজে শত চেষ্টাও করা হয়, তবে সেই চেষ্টার কোন মূল্য নাই। দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতের কাজ অতি কঠিন ও আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া অতি তুচ্ছ ও মূল্যহীন। সেই কাজের জন্য অন্যের সাহায্য নিতে এত আপত্তি কেন? ইহা শয়তানের ধোঁকা ভিন্ন আর কিছু নয়। ইহা তাহাদের ঈমানের কমজোরী এবং তাহাদের ভিতরে আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-এর মহব্বত ও ভয় না থাকার নিদর্শন।

এখন জানা আবশ্যক যে, এমন কি কোন হাদিস বা কোরআনের বাণী আছে যে, প্রথম তকবীরের সময় হুজুরীদিল হইলেই নামাজ শুদ্ধ হইয়া যাইবে? বরং নামাজের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত হুজুরীদিলে নামাজ পড়া সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে বহু আয়াত ও হাদিস রহিয়াছে। নামাজের মধ্যে অন্তঃকরণকে (দিলকে) হাজির রাখিয়া ভীতি ও ভক্তি সহকারে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহতায়ালাকে হাজির-নাজির জানিয়া, তাহার ধ্যান ও নামে বিভোর হইয়া নামাজ পড়াকে নামাজের প্রাণ বলা হয়। এই মর্মে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কালামের সূরা ত্বোয়াহা, আয়াত ১৪-এর প্রথম রুকুতে বলিয়াছেন– 'ওয়া আক্বিমুস্বস্বালা-তা লিযিকরী'। অর্থ: আমাকে (আল্লাহকে) স্মরণ করার জন্য নামাজ কায়েম কর। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সমগ্র নামাজেই আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ করিতে হইবে এবং তাহার স্মরণ ও ধ্যানই নামাজের আসল উদ্দেশ্য। তাই রাসুল (সঃ) বলিয়াছেন– 'আন তা'য়াবু-দাল্লাহা কা-আন্নাকা তারাহু ফাইন্ লাম তাকুন্ তারাহু ফাইন্নাহু ইয়ারাক'। অর্থ: তুমি এমনভাবে আল্লাহতায়ালার বন্দেগী কর, যেন তুমি আল্লাহকে দেখিতেছ। যদি উহা না পার তবে এইরূপভাবে আল্লাহর ইবাদত কর, যেন আল্লাহ তোমাকে দেখিতেছেন। এই হাদিস দ্বারা ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে, সমস্ত নামাজেই আল্লাহাতায়ালার মোশাহেদা (দর্শন) লাভ করিতে হইবে। যদি উহাতে অক্ষম হয় তবে কমপক্ষে আল্লাহ দেখিতেছেন, এই খেয়ালে সমস্ত নামাজ আদায় করা আবশ্যক। ইহার ব্যতিক্রম হইলে নামাজ শুদ্ধ হইবে না। অন্য আর এক হাদিসে আছে যে, রাসুল করিম (সঃ) বলিয়াছেন– 'আচ্ছালাতু মিরাজুল মু'মিনিন'। অর্থ: নামাজ মুমিনদের জন্য মিরাজ'। অর্থাৎ, খোদাপ্রাপ্তির সোপান।

আমি এখন তরিকতের বিদ্বেষী এবং শুধু শরিয়ত অবলম্বী আলেম ও মুসল্লিগণকে জিজ্ঞাসা করি, নামাজে আপনাদের মিরাজ কয়দিন হইয়াছে? এতকাল নামাজ পড়িয়া যদি কোনদিন মিরাজ না হইয়া থাকে, তবে রাসুলুল্লাহ (সঃ) কি অসত্য বলিয়াছেন? (নাউযুবিল্লাহ), তিনি সত্যই বলিয়াছেন। কেবল আমাদের নিজের শৈথিল্যে নামাজকে মিরাজ করিয়া তুলিতে পারি না। ইহা করা অসম্ভব নয়, কামেল-মোকাম্মেল মুর্শিদের তাওয়াজ্জুহ্ গ্রহণ করিয়া কঠোর সাধনা ও চেষ্টা করিলেই তাহা সম্ভব হইবে। যদি অসম্ভব হইত তা হইলে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এই কথা বলিতেন না। হযরত আনাছ (রাঃ) হইতে অন্য এক হাদিসে রেওয়ায়েত আছে– যথা: 'ইন্নামাল মু'মিনুনাইয়া কানা ফিছ্ছালাতি ফাইন্নামা ইয়ুনাজি রাব্বাহু'। অর্থ: নিশ্চয় মুমিন ব্যক্তি নামাজের মধ্যে তাহার পালনকর্তার সহিত কথোপকথন করিয়া থাকে।

সম্মানিত পাঠকগণ! এ পর্যন্ত কোরআন ও হাদিসের যে সমস্ত বাণী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে চিন্তা করিয়া দেখুন যে, পুরুষ ও মেয়েলোক উভয়ের জন্যই হুজুরীদিলে নামাজ পড়া ফরজ কিনা? কেহ যদি নিজে নিজে চেষ্টা করিয়া হুজুরীদিল ঠিক করিতে না পারে, তবে যে ব্যক্তি হুজুরীদিল ঠিক করিয়া দিতে পারেন, তাহার নিকট গিয়া হুজুরীদিলে নামাজ পড়ার জন্য চেষ্টা করা ফরজ কি না? জ্ঞানী মাত্রই একথা স্বীকার করিবেন যে, হুজুরীদিলে নামাজ পড়া ফরজ এবং হুজুরীদিলে নামাজ পড়ার জন্য কামেল-মোকাম্মেল মুর্শিদের তাওয়াজ্জুহ গ্রহণ করিয়া চেষ্টা করাও ফরজ।

যাকাত ও ফিতরা প্রসঙ্গে

যাকাত আদায়ের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের সূরা তওবা, ৬০ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'ইন্নামা সদাকাতু লিল ফুকারায়ি ওয়াল মাসাকিনি ওয়াল আমিলিনা আলাইহা ওয়াল মোয়াল্লাজাতি ফাতি কুলুবুহুম ওয়া ফির রেকাবি ওয়াল গারিমিনা ওয়া ফি সাবিলিল্লাহি ওয়াব নিস্ সাবিল ফারিদাতাম্ মিনালাহি ওয়াল্লাহু আলিমুন হাকিম।

অর্থ: সদকা-যাকাত কেবল দরিদ্র-নিঃস্ব, যাকাত আদায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং যাকে মন আকৃষ্ট করা প্রয়োজন তাদের জন্য। অর্থাৎ, নতুন মুসলিম হয় এরকম ব্যক্তি এবং দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, মুসাফিরদের জন্য, মজলুম ও মিসকিনদের মধ্যে যাকাত বিতরণ করতে হবে। ইসলামের পাঁচটি বেনা বা স্তম্ভের মধ্যে যাকাত একটি স্তম্ভ বা ফরজ। সূরা তওবা, ৩৪ নং আয়াতে যাকাত সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'ওয়াল্লাযিনা ইয়াকনিজুনায যাহাবা ওয়াল ফিদ্দাতা ওয়ালা ইয়ুনফিকুনাহা ফী সাবীলিল্লাহী ফাবাশ্ শিরহুম বি-আযাবিন আলিম'।

অর্থ: আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে'। (আয়াত-৩৫) 'ইয়াওমা ইয়ুহ্মা আলাহা ফী-নারি জাহান্নামা ফাতুক ওয়া বিহা জ্বিবাহুহুম ওয়া জুনুবুহুম ওয়া জুহুরুম হা-যা মা কানাস্তুম লি আমফুসিকুম ফাযুকু মা ওয়া কুন্তুম তাকনিযুম'। অর্থ: সে জমাকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যগুলো জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা দাগ দেয়া হবে তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে এবং পৃষ্ঠদেশে। তাদেরকে সেদিন বলা হবে, এটা তা-ই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, এখন উপভোগ কর তা, যা তোমরা সঞ্চয় করে রেখেছিলে'। সূরা তওবা ১৮ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'ইন্নামা ইয়া'মুরু মাসা-জ্বিদাল্লা-হি মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়া আক্বামাস সালাতা ওয়া আ-তায যাকাতা ওয়া লাম ইয়াখ্সা ইল্লাল্লাহা ফা-আসা উলা-ইকা আই ইয়াকুনূ মিনাল মূহতাদীন'।

অর্থ: আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করবে তারা, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না, আশা করা যায় এসব লোকই সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে। হাদিস শরীফে উল্লেখ রয়েছে– 'ওয়া ক্বালান নাবিয়্যু (সঃ) আতাহুল্লাহু মালান ফালান ইউয়াদ্দি যাকাতা মুছসিলু লাহু মানহু ইয়ামাল কিয়ামাতি শুজায়ান আকরা যাবিবাতানি ইউ তাব্বিকুহু ইয়াওমাল কিয়ামা ছুম্মা ইয়া খুজু বি লিহযি মাতায়হি ছুম্মা ইয়া কুলু আনা মালুকা ওয়া কানযুক, (বোখারী শরীফ)।

অর্থ: রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলিয়াছেন– আল্লাহ যাকে ধন দিয়াছেন, সে যদি উহার যাকাত আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন তাহার ধন নেড়িসাপে পরিণত করা হবে। উহার দুই চক্ষুর উপরিভাগে দুটি হলদে দাগ থাকিবে, ঐ সাপ উহার মালিকের গলদেশ জড়াইয়া ধরিবে ও দুই গণ্ড ধরিয়া বলিবে, আমি তোমার গোলায় আবদ্ধ সেই ধন-সম্পদ (বোখারী শরীফ)। হাদিস– 'ওয়াক্বালা আলাই হিস সালাম মা তালিফা মালুন ফি বার-রিন ওয়ালা বাহরিন ইল্লা বি হাবসিয যাকাত, (তিবরানী)। অর্থ: হুজুর (সঃ) বলেন– জলভাগে ও স্থলভাগে মানুষের যে ধন-দৌলত বিনষ্ট হয়, তাহা শুধু যাকাত বন্ধ করার কারণে হইয়া থাকে।

হাদিস- 'ওয়া আনহু আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মা মানা-আ কাওমুনিস যাকাতা ইল্লা হাবা সালাহু আনহুমুল মাতার, (তাবরানী)। অর্থ: নবী করিম (সঃ) বলেন–

কোন সম্প্রদায় যাকাত বন্ধ করিলে আল্লাহ বৃষ্টি বন্ধ করিয়া তাহাদেরকে শাস্তি দিয়া থাকেন। হাদিস– 'ওয়া ক্বাদ জা-য়া ফিল হাদিস মানিস তাফাদা মালান ফালা যাকাতা ফি হাত্তা ইয়া হুলা আলাইহিল হাওলু। অর্থ: হাদিসে আছে– খাটানো ধন-দৌলতের ওপর যাকাত ফরজ হয় তখনই, যখন উহা এক বছর খাটে, (তিরমিযি শরীফ)।
সারাবছর কাজ কর্ম করে আয়-ব্যয় শেষে যার কাছে ৫২, ৫০০ (বায়ান্ন হাজার পাঁচশত) টাকা থাকবে তার জন্য যাকাত ফরজ হবে। সে যদি যাকাত না দেয় তাহলে গরিবের হক তার সম্পদে থেকে যাবে। সে যাকাতের পরিমাণ ২.৫% (শতকরা আড়াই টাকা)। সে যাকাত না দেওয়ার কারণে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে।

সদকায়ে ফিতর

হাদিস- 'আন আবদিল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ক্বালা আমারা নাবিয়্যু বি যাকাতিল ফিতরি ছা-আন মিন তামারি আউছা-আম মিন শারিন ক্বালা আবদুলাহ ফাজাআলান-নাসু আদিলাহুম মুদ্দাইনে হিনতাতিন'।
অর্থ: হযরত আবদিল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করিম (সঃ) আদেশ করিয়াছেন ঈদুল ফিতরের ফিতরা বাবদ মাথাপিছু 'এক ছা' খেজুর অথবা এক ছা যব দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞ মহাপুরুষগণ উহাকে দুই মুদ্দ গমে পরিণত করে নিয়াছেন, ইহাই বর্তমান বিশ্বে গৃহীত বা অনুমোদিত। অর্থাৎ অর্ধ ছটাক মাথাপিচু এক সের সাড়ে বারো ছটাক হিসাবে পরিবারের কর্তা তার পরিবারাস্থ ছোট-বড় এমনকি গোলাম-বাদীসহ সকলের এক ছা হিসাবে আদায় করিতে হইবে। ফিতরা ওয়াজিব হয় যার নিকট ঈদের দিন হিসাব-নিকাশ ও খরচাদি আদায়ের পর এক ছা পরিমাণ মাল অতিরিক্ত পাওয়া যাইবে তার উপর ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব।
নং মাসায়ালা: ঈদের দিন সোবহে সাদিকের সময় সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়, কাজেই কেহ ইহার কিছু আগে মারা গেলেও তাহার ফিতরা ওয়াজিব হয় না। তার সম্পত্তি হইতে উহা দিতে হয় না। সাহেবে নেসাবের সুবহে সাদিকের পূর্বে কোন সন্তান জন্ম নিলে তাহার ফিতরা দিতে হবে; কিন্তু উহার পরে ভূমিষ্ঠ হইলে ফিতরা দিতে হইবে না। এইরূপে কেহ ঈদের দিন সোবহে সাদিকের সময় নতুন মুসলমান হইলে তার উপরও ফিতরা ওয়াজিব হইবে না।
নং মাসায়ালা: ঈদের নামাজ আদায়ের পূর্বেই সদকায়ে ফিতর দিয়া দেওয়া মোস্তাহাব, কোনক্রমে আগে দিতে না পারিলে পরে দিলেও আদায় হইয়া যাইবে।
নং মাসায়ালা: কেহ যদি ঈদের দিনের আগেই রমজানের মধ্যে ফিতরা আদায় করিয়া দেয়, তাহাও জায়েজ আছে; ঈদের দিন পুনরায় দিতে হইবে না।
নং মাসায়ালা: ঈদের দিন ফিতরা না দিলে উহা মাফ হইয়া যাইবে না। অন্য সময় দিতে হইবে।
নং মাসায়ালা: ফিতরা গম বা গমের আটা বা গমের ছাতু দ্বারা দিলে পরিমাণ আশি তোলার সেরে এক সের সাড়ে বারো ছটাক, কিন্তু পুরা দুই সের বা পৌনে দুই কেজি দেওয়াই উত্তম। কেননা বেশি দিলে অধিক ছওয়াব মিলে।

রাসুল (সঃ) সকল জায়গায় (হাজির-নাজির) উপস্থিত এমনকি মানুষের মুমিন অন্তরেও অবস্থান করেন

নবীজির হাজির-নাজির সম্পর্কে কুরআনুল কারিমে সূরা- ফাত্হ, ৮নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'ইন্না আরসালনা-কা শা-হিদাওঁ ওয়া মুবাশ্শিরাওঁ ওয়া নাজিরা'। অর্থ: হে হাবীব (সঃ) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে হাজির-নাজির বা প্রত্যক্ষকারী সাক্ষি, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী নবী-রাসুল হিসাবে প্রেরণ করেছি।

সূরা মোজাম্মেল, ১৫ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা আরো বলেন– 'ইন্না আরসালনা ইলাইকুম রাসূলান শা-হিদান আলাইকুম'। অর্থ: নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে একজন রাসুল প্রেরণ করিয়াছি, যিনি তোমাদের হৃদয়ে হাজির-নাজির উপস্থিত বা প্রত্যক্ষকারী সাক্ষিদাতা। সূরা আহ্যাব, ৬নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'আন্নাবিয়্যু আওলা-বিল্ মু'মিনীনা মিন আনফুসিহিম'। অর্থ: নবীজি (সঃ) মানুষের মুমিন অন্তরে অবস্থান করেন। সূরা নিসা, ৮০ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা আরো বলেন– 'মাই ইউত্বি'ইর রাসূলা ফাক্বাদ আত্বা-আল্লা-হ'। অর্থ: যে রাসুল (সঃ)-এর আনুগত্য করল, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল।

সূরা নিসা, ১৫০ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা আরো বলেন– 'ওয়া ইউরীদূনা আইঁ ইউফাররিকু বাইনাল্লা-হি ওয়া রুসুলিহী'। অর্থ: তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের মধ্যে পৃথক কর না। ব্যাখ্যা: নবী করিম (সঃ) আপনার প্রকৃত রূপ তো মানবীয় দেহের আবরণে ঢাকা পড়ে আছে। আপনাকে আপনার গোপনকারী ও আবরণকারী মাহাবুব ছাড়া কেহই চিনিতে পারে নাই, (মৌলভী আবুল কাশেম নানুতবী, প্রতিষ্ঠাতা– দেওবন্দ মাদ্রাসা)।

কিছু কিছু ভ্রান্ত আকিদা বর্ণনাকারী বলিয়া থাকেন যে– রাসুল (সঃ) হাজির-নাজির হতে পারেন না, অথচ তাদের শিক্ষাগুরু, মুরুব্বিরাই রাসুল (সঃ)-এর হাজির-নাজিরের কথা বলিয়া গেছেন এবং তা আমল করে গেছেন। তাদের পীরদের পীর, ওস্তাদদের ওস্তাদ মৌলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেব, তিনিও রাসুল (সঃ)-এর হাজির-নাজিরের কথা বলিয়াছেন এবং তা আমলও করে গেছেন। কিন্তু বর্তমানে কিছু ভ্রান্ত আকিদায় বিশ্বাসীগণ তা অস্বীকার করেন এবং অন্যদেরকেও বিশ্বাস না করার নির্দেশ দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ করেন এবং আল্লাহর রহমত থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখেন। মৌলভী আশরাফ আলী থানবী একই সময়ে কয়েক জায়গায় হাজির-নাজির থাকার ঘটনা। খাজা আজিজুল হাসান সাহেব তাঁর কিতাবে মৌলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেবের নিম্নবর্ণিত আশ্চর্যজনক বেশ কিছু ঘটনা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তা থেকে দুটি ঘটনা হুবহু উপস্থাপন করা হল– অনেক দিন হল এক ব্যক্তি আমাকে এ খানকায় তার ঘটনাটি বর্ণনা করেন। হুজুরকে তো এখানে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কি জানি এখন তিনি কোথায় যাচ্ছেন? কেননা আমি একবার নিজেই হুজুরকে থানাবুনে থাকা সত্ত্বেও আলীগড়ে দেখেছি। তখন সেখানে একটি মেলা হচ্ছিল এবং মেলায় তখন মারাত্মক আগুন লেগেছিল। সেদিন আছরের সময় থেকে আমার মনে অস্বাভাবিক একটি ভয় হচ্ছিল। বেচা-কেনার মোক্ষম সময়ে আমি দোকানে মালপত্র বাক্সে রাখছিলাম। মাগরিবের পর অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতা দেখা দিল। আমি বিচলিত হয়ে পড়লাম। হে আল্লাহ! মালগুলো কীভাবে দোকানের বাইরে নিয়ে যাই? কারণ, আমি একা আর বাক্সগুলোও ভারী। এসময়ে আমি হঠাৎ দেখি আমার পীর (থানবী) আমার সামনে হাজির। তিনি একটি বাক্সের এক অংশ ধরে বললেন, তাড়াতাড়ি উঠাও। সে মতে এক দিকে তিনি ধরলেন অন্য দিকে আমি ধরলাম। এভাবে অল্পক্ষণের মধ্যেই বাক্সগুলো বের করে ফেললাম।

সেই অগ্নিকাণ্ডে অন্যান্য দোকানদারদের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু আমার মালপত্রসমূহ ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়, (আসরাফুস সাওয়ানেহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭১)। মৌলভী আশরাফ আলী থানবীর প্রপিতামহের অলৌকিক ঘটনা। মৌলভী আশরাফ আলী থানবীর প্রপিতামহ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন সাহেব এক বর-যাত্রীর সাথে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ডাকাত দল আক্রমণ করল। তার কাছে তীর-ধনুক ছিল। তিনি সাহস করে তীর নিক্ষেপ করলেন। ডাকাতদের সংখ্যা অধিক হওয়ায় ওই মোকাবেলায় তিনি শহীদ হন। এরপর এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। জনাব ফরিদ উদ্দিন রাতে নিজের ঘরে জীবিত মানুষের মত তশরিফ আনলেন এবং স্ত্রীর হাতে মিষ্টি দিয়ে বললেন, যদি তুমি আমার এ সাক্ষাৎ-এর বিষয় কারো কাছে প্রকাশ না কর, তাহলে আমি এভাবে প্রতিদিন আসব। কিন্তু তার স্ত্রী পরবর্তীতে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কথাকে চিন্তা করে, ঘটনাটি প্রকাশ করে দেন। এরপর তিনি আর দেখা দেননি। এ ঘটনাটি তাদের বংশের মধ্যে কিংবদন্তি হয়ে আছে, (আশরাফুস সাওয়ানেহ, প্রথম খণ্ড, পৃ:১২)। কোরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে, রাসুল (সঃ) হাজির-নাজির তো বটেই, আল্লাহর অলি-আউলিয়াগণও ভক্ত-মুরিদের কাছে তদ্রূপ উপস্থিত হইয়া তাকে সাহায্য করে থাকেন, তার প্রমাণ স্বরূপ মৌলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেবের দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হইল।

হযরত সোলায়মান (আঃ) ক্ষুদ্র প্রাণী পিপীলিকার কাছে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করলেন

হযরত সোলায়মান (আঃ) তামাম পৃথিবী পরিচালনা করতেন যিনি এত বড় নবী হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুদ্র প্রাণী পিপীলিকার কাছ থেকে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করলেন কোরআনুল কারিমের সূরা আন নামল, ১৮ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'হাত্তা- ইযা আতাও আলা- ওয়া-দিন্ নাম্‌লি, ক্বা-লাত নামলাতুই ইয়া- আইয়্যুাহান নামলুদখুলূ মাসা- কিনাকুম, লা ইয়াহত্বিমান্নাকুম সুলাইমা-নু ওয়া জুনুদুহূ, ওয়া হুম লা ইয়াশ উরূন। অর্থ: যখন তাঁর বাহিনী পিপীলিকার ময়দানে এসে পৌঁছল, তখন একটি পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকার দল! তোমরা নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর, যেন সোলায়মান ও তাঁর বাহিনী তোমাদেরকে পদদলিত না করে তাদের অজান্তে।

বিস্তারিত বর্ণনা : পিপীলিকার রাজার সাথে আলোচনা–

একদা হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর লোক-লস্কর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করে এক নতুন জায়গায় গিয়ে অবতরণ করলেন। সেখানে অবতরণ করা মাত্র তিনি শুনলেন পিপীলিকার রাজা চিৎকার করে বলছে, হে পিপীলিকার দল! তোমরা অতিসত্বর নিজ নিজ গর্তে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর, কারণ সোলায়মান (আঃ) তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর সৈন্য অলক্ষে হয়ত তোমাদেরকে পদদলিত করে ফেলবে। হযরত সোলায়মান (আঃ) পিপীলিকার কথা শুনে হাসলেন এবং বললেন, ক্ষুদ্র প্রাণি পিপীলিকার রাজা এতটা সতর্ক এবং দয়াবান তা আমি কোনদিন ভাবিনি। তিনি তখন পিপীলিকার রাজাকে হাতে তুলে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার প্রজাবৃন্দের প্রতি এতটা মেহেরবান কেন এবং আমার সম্পর্কে যে উক্তি করেছো তাতে মনে হয় আমি প্রাণীকুলের ওপর জুলুম করে থাকি। আমার ওপর এভাবে কেন দোষারোপ করলে? পিপীলিকার রাজা তখন উত্তর দিল, হে আল্লাহর খলিফা! আপনি আল্লাহতায়ালার শ্রেষ্ঠ নবী। তাই আপনার দায়িত্ব অনেক বড়। আমরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রাণী, আমাদের দায়িত্বও ক্ষুদ্র। আল্লাহতায়ালা আমার উপর প্রজাদের ভালো-মন্দ দেখা-শুনার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সে হিসেবে তাদের সুখে আমি সুখি হই এবং তাদের দুঃখে আমি অস্থির হয়ে পড়ি। এছাড়া যাদের ভালো-মন্দ তদারকির দায়িত্ব আল্লাহতায়ালা আমার ওপর অর্পণ করেছেন। এ জন্য আপনার সৈন্যদের আগমন এবং তাদের অশ্ব চালনার সময় তাদের বেখেয়ালে আমার প্রজাবৃন্দ পদদলিত হতে পারে। এ আশঙ্কায় আমি তাদেরকে সর্তক করে দিয়েছি। দ্বিতীয়ত আপনাকে জালেম বলার ধৃষ্টতা আমার মাঝে আদৌ নেই। শুধু আপনার সৈন্যদের বেপরোয়া অশ্ব চালনার বিষয়ে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম যে, ক্ষুদ্র প্রাণীদের বড় প্রাণীরা কোন পরোয়া করে না। তাই তাদের অশ্ব পদতলে পিপীলিকারা পিষ্ট হওয়ার অতি সম্ভাবনা দেখে আমি তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছি। আপনাকে দোষারোপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেন, তোমার কথা শুনে আমি খুশি হয়েছি। এখন বলতো তোমাদের পিপীলিকাদের সৈন্য সংখ্যা কত? পিপীলিকার রাজা উত্তর দিল– ধরুন পিপীলিকাদের প্রধান সেনাপতির সংখ্যা চল্লিশ হাজার। প্রত্যেক সেনাপতির অধিনে চল্লিশ হাজার সুবেদার। প্রত্যেক সুবেদারের অধিনে রয়েছে চল্লিশ হাজার হাকিম। প্রত্যেক হাকিমের অধিনে রয়েছে চল্লিশ হাজার ফৌজদার। হযরত সোলায়মান (আঃ) এ পর্যন্ত শুনে বলেলন, আচ্ছা বুঝেছি সৈন্য সংখ্যা বিরাট। আচ্ছা এখন বল তোমার রাজ্য ভালো? না আমার রাজ্য ভালো? পিপীলিকার রাজা বললো, আমার রাজ্য আপনার

রাজ্যের চাইতে উত্তম। কারণ, জিন দ্বারা আপনার সিংহাসন তৈরি করে উহা বাতাসের সাহায্যে পরিচালনা করছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে আপনি পর নির্ভরশীল আর আমার কোন সিংহাসন নেই। তাই কারো উপর ক্ষণিকের জন্যও আমাকে নির্ভর করতে হয় না। হযরত সোলায়মান (আঃ) পিপীলিকার কথা শুনে বললেন, তোমার মাথায় এত বুদ্ধি, তোমার কথায় এত যুক্তি এ সমস্ত তুমি কোথায় শিখলে? পিপঁড়াদের রাজা বললো, হে আল্লাহর নবী! যে মহান আল্লাহতায়ালা আপনাকে বিশাল রাজ্য ও অশেষ বিদ্যা এবং জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সে মহান আল্লাহ আমার প্রাপ্য জ্ঞান ও বিদ্যা আমাকেও দান করেছেন।

হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেন, তুমি অনেক জ্ঞানের অধিকারী। অতএব, তুমি আমার রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কর। পিপীলিকা-রাজ তখন বলল, হে আল্লাহর খলিফা! আপনার রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি আলোচনা করা আমার জন্য বেয়াদবি। তবে আপনি যখন আমাকে অত্যন্ত আদরের চোখে দেখেন সে হিসেবে সমালোচনার উদ্দেশ্যে নয় বরং আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে কিছু বলতে পারি। আপনি আল্লাহতায়ালার দরবারে রাজ্যলাভের জন্য দোয়া করেছিলেন। হে প্রভু! আমাকে এমন এক সুন্দর বৃহৎ রাজ্য দান কর যার উপযোগী একমাত্র আমি থাকব। আমার পরে যেন কেউ আর এ ধরনের রাজ্য অধিপতি না হতে পারে। তুমি মহান দাতা। হে আল্লাহর খলিফা! এ ধরনের এক ঈর্ষামূলক দোয়া করা আপনার ন্যায় একজন পয়গম্বরের পক্ষে কতদূর সমীচীন হয়েছে তা জানি না। কথাটি যে ঈর্ষামূলক তাতে সন্দেহ নেই। আপনাকে আল্লাহ বিশাল রাজ্যের অধিপতি করেছেন। জিন-পরী, আগুন, বাতাসকে আপনার বাধ্য করে দিয়েছেন এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। আপনার পরে আল্লাহ যদি আরো কয়েকজনকে এরূপ বিশাল রাজ্যের অধিপতি করেন তাতে আপত্তি কেন? এ আপত্তি দ্বারা কী প্রমাণিত হয়, তা আপনি একবার ভেবে দেখুন। একজন নবীর পক্ষে এধরনের ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্বলিত দোয়া খুবই বেমানান।

হযরত সোলায়মান (আঃ) পিপীলিকা-রাজের কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তার বাকশক্তি রোধ হয়ে গেল। তিনি এ সমস্ত কথার কোন জবাব দিতে আর সক্ষম হলেন না। শুধু এতটুকু বললেন, ভাই পিপীলিকা-রাজ তোমার দৃষ্টিতে আমার আর কি ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে তা আমাকে বলে দাও। পিপীলিকা রাজ বলল, আমার কথায় আপনি একটু বেজার হয়েছেন বটে। তবে আপনাকে উচিত কথা বলার ওয়াদা দিয়েছি, তাই আমাকে নির্দ্বিধায় কথাগুলো বলতে হবে। আপনাকে আল্লাহতায়ালা যে বেহেশতি আংটি দান করেছেন, তার বরকতে আপনি পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত সমগ্র পৃথিবীর উপর রাজত্ব করে যাচ্ছেন। জীন-পরী, মানব- দানব, পশু-পক্ষী, আগুন ও বাতাসের ওপর প্রভুত্বের অধিকারলাভ করেছেন। সর্বোপরি বিশাল রাজত্ব ও নবুয়তি দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। এগুলো সম্পূর্ণ আংটির বদৌলতে আপনি লাভ করেছেন। আপনার ব্যক্তিগত কোন যোগ্যতায় এ সমস্ত আপনি লাভ করেন নাই। সবই আল্লাহতায়ালার প্রদত্ত। সেই আংটির মহাত্ম ও বরকত লাভ করেছেন। যদি এই আংটি আপনার হাত থেকে নিয়ে নেওয়া হয়, তখন আপনার এই শ্রেষ্ঠত্ব কিছুই থাকবে না। অতএব সে সময়ের কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে যে পরিমাণ শোকর-গুজারি করা উচিৎ তা সম্পূর্ণ হচ্ছে না।

এরপরে বাতাসকে আল্লাহতায়ালা আপনার অধীন করে দেওয়ার তাৎপর্য হল, বাতাস দেখা যায় না, ধরা যায় না, শুধু তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় মাত্র। এভাবে এক আকৃতিবিহীন শক্তিকে আপনার অধীন করে দেওয়ার মাধ্যমে আপনাকে এ শিক্ষা প্রদান

করা হয়েছে যে, সমস্ত শক্তি, দাম্ভিকতা ও জৌলুসের বড়াই ভিত্তিহীন। সবকিছুর মূল অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সবকিছুই আকৃতি বিহীন, বাতাস সমতুল্য, মৃত্যুর পর পার্থিব সবকিছুকে বাতাসের ন্যায় মনে হবে। কিছু দেখা যাবে না, স্পর্শ করা যাবে না শুধু অনুভব করা যাবে মাত্র। এ সমস্ত কথা শুনে হযরত সোলায়মান (আঃ) পিপীলিকা-রাজকে মাটিতে রেখে নিজ পথ চলতে আরম্ভ করলেন। তখন পিপীলিকা-রাজ বলল, হে আল্লাহর খলিফা! আপনি গরিবদের দ্বারে এসে খালি মুখে যাবেন তা হয় না। আপনি দয়া করে কিছু মুখে দিয়ে যান। হযরত সোলায়মান (আঃ) কথা শুনে দাঁড়ালেন। তখন পিঁপড়ারাজ তার লস্করদেরকে নাস্তা দেবার জন্য হুকুম দিল। অমনি তারা একখানা ভাজা ফড়িং-এর ঠ্যাং নিয়ে আসল। হযরত সোলায়মান (আঃ) তা দেখে একটু হাসলেন। পিপীলিকারাজ তখন বলল, হুজুর! আপনি হাসছেন কেন? ক্ষুদ্র খাদ্য দ্রব্য অনেক সময় বরকতপূর্ণ হয়ে অনেক মানুষকে পরিতৃপ্তি দান করতে পারে। আর বিশাল খাদ্যস্তুপ অনেক সময় শুধু একটি মাছের খাদ্য হিসাবে যথেষ্ট হয় না। এগুলো সব আল্লাহতায়ালার নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়। অতএব আপনি লোক-লস্করসহ বিস্‌মিল্লাহ বলে মুখে দিন। আল্লাহ এতেই বরকত দান করবেন। হযরত সোলায়মান (আঃ) ফড়িংয়ের ঠ্যাং থেকে একটু সামান্য অংশ নিয়ে মুখে দিলেন। তিনি অনুভব করলেন, এই বিচ্ছিন্ন অংশটি অনেক বড় হয়ে তার হাতে উঠেছে। মুখে দিলেন আর বড় আকার ধারণ করছে। যখন তিনি গিলে ফেললেন, তখন তাঁর পেট পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি তাঁর সঙ্গীয় সৈন্য, লোক-লস্কর ও আমির ওমরাহ্‌গণকে একটু একটু অংশ নিয়ে খেতে বললেন। সকলেই এক চিমটি করে কাবাব খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন। দ্বিতীয় বার আর কেউ সামান্য খেতে উদ্দত হল না। কয়েক হাজার মানুষ এভাবে খাবার কাজ সমাধান করল। তাতে দেখা গেল ভাজা ফড়িং-এর ঠ্যাং এক চতুর্থাংশ মাত্র শেষ হয়েছে। হযরত সোলায়মান (আঃ) পিপীলিকা-রাজের সাথে আলাপ করা এবং আতিথেয়তা গ্রহণ ইত্যাদি সব কিছুই আল্লাহতায়ালার এক অপূর্ব পরীক্ষা বলে মনে করলেন। পিপীলিকা-রাজের কাছে এলেম শিক্ষার পর, তিনি বাকি জীবনে কোনদিন আর হাসি-খুশি ও আনন্দ-ফূর্তির মধ্যে মুহূর্তকাল কাটাননি। রাজ্যের অধিকাংশ কার্যাদি বণ্টন করে দিয়ে নিজে এবাদতখানায় সেজদায় পড়ে কেঁদে কাটাতেন এবং দিনের নির্দিষ্ট একটি সময় মানুষকে দ্বীনের তালিম-তালকিন, জিকির-আজকার ও এলমে মারেফতের জ্ঞান দান করতেন।

সম্মানিত পাঠকগণ, আপনারাই চিন্তা করে দেখুন সূরা নামলের ১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা করে দেখা বা জানা গেল, মানব-দানব, জীন-পরী, দেও-দানব, পশু-পাখি আল্লাহর সৃষ্টিকুল কায়েনাত যার অধীনস্থ ছিল, সে নবীই একটা ক্ষুদ্র প্রাণীর কাছে এসে কিছু দিন আধ্যাত্মিক জ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করলেন। কাজেই আপনারা ভেবে দেখুন যে, বাতেনী এলেম শিক্ষা করার জন্য একজন কামেলপীর বা মুর্শিদের কাছে যাওয়ার দরকার আছে কি না?

আল্লাহতায়ালার নিগূঢ় রহস্যের মহামূল্যবান বাণী

নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সর্বময় কর্তা আল্লাহতায়ালা যাঁর কোন লয় নাই, ক্ষয় নাই। আল্লাহর সৃষ্টির অবশ্যই একটি নিগূঢ় রহস্য রয়েছে। ওই নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করাই সত্যিকার মানুষের কাজ। যিনি প্রতিদিন কর্ম ও সাধনার বলে উক্ত পর্দা ও রহস্য ভেদ করিয়া আল্লাহতায়ালার নৈকট্যলাভ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী ও মহা-মানব। আর যাহারা অক্ষম ইহা করিতে চেষ্টা করে না তারাই অমানুষ বা পশুতুল্য। মানুষ কে? পরিচয় জানতে হইলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। প্রকৃতপক্ষে আত্মার আবরণটাকেই অর্থাৎ আভ্যন্তরিণ আকৃতিটাকে আমরা মানুষ বলিয়া ধারণা করিয়া থাকি। কিন্তু উহার আভ্যন্তরীক রহস্য যে কি? উহা অনেকেরই অগোচরে রহিয়াছে। যারা আল্লাহর প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়া আমলের সাহায্যে আভ্যন্তরীণ খবরাখবর জানিতে পারেন, তারাই সৃষ্টির সেরা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বা মানুষ রূপধারী অলি-আউলিয়া। মানুষ যতক্ষণ আল্লাহর নিদর্শন অর্থাৎ, চিহ্ন প্রত্যক্ষ-রূপ দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত থাকিবে অর্থাৎ, নূরে মোহাম্মদীর রূপে উহাতে দৃষ্টিগোচর না হইবে ততক্ষণ ওই আত্মা কলুষিত। অতএব আত্মার সংশোধন করাই প্রত্যেকটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য। যে আত্মার সংশোধন করিয়াছে, সে-ই সফলতা লাভ করিয়াছে। আত্মার সঙ্গে নফসও জড়িয়ে আছে। আত্মার বাহনই নফস। উক্ত নফসে আম্মারাই অগণিত কু-কর্মের দাস ও আমিত্বের হিংসা ও আবর্জনায় জড়িয়ে থাকে। যে সমস্ত মানুষেরা নিজের নফসের সাথে, কু-রিপুর সাথে জিহাদ করিয়া জয়ী হইয়াছে, সে আত্মাই অনাবিল শান্তির ছায়া লাভ করিয়া অমর হইয়াছে।

ঈদুল আযহার কোরবানি
পিতা করে পুত্র জবাই এমন ত্যাগের তুলনা নাই

ঈদুল আযহার কোরবানি : এক হৃদয় বিদারক ইতিহাস পিতা করে পুত্র জবাই এমন ত্যাগের তুলনা নাই

(সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত ১০২-১২)

১০২- 'ফালাম্মা বালাগা মা'আহুস সাইয়া ক্বা-লা ইয়া বুনাইয়া ইন্নি আরা-ফিল মানা-মি আন্নী আয্-বাহুকা ফান্‌জুর মা-যা তারা; ক্বা-লা ইয়া আবাতিফ্ আল্ মা-তু'মারু সাতাজিদুনী ইনশা আল্লা-হু মিনাস্ব স্ব-বিরীন'।

অর্থ: যখন সে সন্তান (ইসমাইল) তার পিতার সাথে চলা-ফেরার মত বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহিম (আঃ) বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি। এখন তুমি ভাবিয়া দেখ, এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী? তিনি (ইসমাঈল) বললেন, হে আমার আব্বা! আপনাকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেইভাবেই তাহা পালন করুন। আপনি আমাকে পাবেন ধৈর্য্যশীল হিসেবে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন।

১০৩- 'ফালাম্মা আসলামা-ওয়া তাল্লাহু লিলজ্বাবিন'।

অর্থ: যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রদর্শন করলেন এবং তিনি তাঁর পুত্রকে কাৎ করে শোয়াইলেন।

১০৪- 'ওয়ানা দাইনা-হু আই ইয়া ইব্রাহিম'। অর্থ: তখন আমি (আল্লাহ) তাকে ডেকে বললাম, হে ইব্রাহিম!

১০৫- 'ক্বাদ স্বাদ্দাক্বতার রু'ইয়া ইন্না-কাযা-লিকা নাজ্বযিল মুহ্‌সিনীন'। অর্থ: আপনি আপনার স্বপ্ন সত্যিকারভাবেই বাস্তবায়ন করেছেন। এভাবেই আমি পূণ্যবানদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

১০৬- 'ইন্না হা-যা লাহুয়াল বালা-উল্ মুবীন'।

অর্থ: নিশ্চয়ই এটা ছিল একটি প্রকাশ্য পরীক্ষা।

১০৭- 'ওয়া ফাদাইনা-হু বিযিব্‌হীন আজীম'।

অর্থ: এবং আমি তার জবেহর বিনিময়ে, বড় একটি জবেহর পশু দিয়ে দিলাম।

১০৮- 'ওয়া তারাক-না আলাইহি ফিল আখিরীন'

অর্থ: তার উত্তম আলোচনা পরবর্তীদের মাঝেও জারি রেখেছি।

১০৯- 'সালা-মুন্ আলা ইব্রাহিম'। অর্থ: সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক ইব্রাহিমের প্রতি।

১১০- 'কাযা-লিকা নাজ্বযিল্ মুহসিনীন'।

অর্থ: আমি এভাবেই পূণ্যবানদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

১১১- 'ইন্নাহু মিন্ ইবা-দিনাল মু'মিনীন'।

অর্থ: সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের মধ্য হতে।

১১২-ওয়া বাশ্‌শারনা-হু বিইসহা-কা নাবিয়্যাম মিনাস্ব স্বা-লিহীন'।

অর্থ: আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাক সম্পর্কে, যিনি নবী হয়ে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

বিস্তারিত ঘটনা:

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) স্বপ্নে দেখলেন, কে যেন তাঁকে বলছে– 'হে আল্লাহর দোস্ত! আপনি আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করুন। নবীর প্রতি স্বপ্ন আদেশ ওহির সমতুল্য। তাই হযরত ইব্রাহিম (আঃ) স্বপ্নে কোরবানির আদেশ পেয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন।

অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তিনি দুম্বা, উট কোরবানি করে দিলেন। দ্বিতীয় রাতে তিনি আবার স্বপ্ন দেখলেন, কেউ একজন তাঁকে বলছেন– 'হে নবী আপনি আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করুন।

এবারেও নবী দুই'শ উট কোরবানি করলেন। অতঃপর তৃতীয় রাতেও তিনি একই স্বপ্ন দেখলেন। তৃতীয় বারেও তিনি দুই'শ উট কোরবানি করলেন। চতুর্থ রাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন– 'কে যেন তাকে বলছেন– 'হে আল্লাহর দোস্ত! আপনি আল্লাহর রাস্তায় আপনার প্রিয় বস্তু বা সন্তানকে কোরবানি করুন। এবারের স্বপ্ন দেখে তিনি বুঝতে পারলেন প্রিয় বস্তু তাঁর সন্তান হযরত ইসমাইল (আঃ)। সে সন্তান তাঁর নির্বাসিত মাতার নিকট থাকে। নবী তাঁদের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক পর্যন্ত রাখেন না। এমতাবস্থায় এহেন এক চরম প্রত্যাদেশ কীভাবে তিনি কার্যকর করবেন, এ কথা ভেবে স্থির করলেন ভোরবেলায় নবী তাঁর আর এক স্ত্রী সায়েরার নিকট তাঁর স্বপ্নের কথা আলোচনা করলেন। সায়েরা নবীকে অতি সত্ত্বর স্বপ্নের আদেশ কার্যকর করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন।

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। সঙ্গে তিনি একখানা ছুরি ও কিছু রশি নিলেন। তিনি মক্কা পৌঁছে হাজেরা যেখানে অবস্থান করতেন, সেখানে গিয়ে বসলেন। সেখানে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে হাজেরাকে বললেন, তুমি ইসমাইলকে ভালো পোশাক পরিয়ে, আতর গোলাপ লাগিয়ে উত্তমরূপে সাজিয়ে দাও। ইসমাইলকে আমি এক জায়গায় নিয়ে যাব। অনেকদিন যোগাযোগ না থাকার পর পিতা পুত্রের নতুন করে গভীর সম্পর্ক হতে যাচ্ছে দেখে হাজেরা খুব খুশি হলেন এবং পুত্র ইসমাইলকে উত্তমরূপে সাজিয়ে দিলেন। হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বয়স ছিল তখন তের/চৌদ্দ বছর। দেখতে ফুটফুটে সুন্দর।

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) পুত্রকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। ইতোমধ্যে শয়তান এসে বিবি হাজেরাকে বলল, তোমার পুত্র ইসমাইল কোথায়? হাজেরা বললেন, তার পিতার সঙ্গে এক জায়গায় গিয়েছে। শয়তান বলল, মিথ্যা কথা, তোমার স্বামী পুত্রকে কোরবানি করার জন্য আল্লাহতায়লার আদেশ পেয়েছেন। সে মর্মে ইসমাইলকে কোরবানি করার জন্য এক নির্জন স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন। বিবি হাজেরা মানুষ সুরতধারী শয়তানকে বললেন, যদি আল্লাহতায়লা কোরবানির মাধ্যমে ইসমাইলকে কবুল করেন, তবে আলহাম্‌দুলিল্লাহ! এতে আমার উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই। শয়তান যখন এখানে কোন সুবিধা করে উঠতে পারল না, তখন হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর নিকট গিয়ে পিছন থেকে ইসমাইল (আঃ)-কে বলল, ইসমাইল! তুমি কোথায় যাচ্ছ? ইসমাইল (আঃ) বললেন, আমি পিতার সঙ্গে এক জায়গায় যাচ্ছি। শয়তান বলল, আল্লাহতায়ালার নির্দেশে তোমাকে কোরবানি করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। একটু পরে তোমার গলায় ছুরি চালিয়ে আল্লাহর নামে কোরবানি করা হবে। হযরত ইসমাইল (আঃ) তখন বললেন, আল্লাহতায়ালা যদি আমার বাবার মাধ্যমে আমাকে কোরবানি করেন, তাহলে আমার জীবন ধন্য হবে। এতে আপত্তি করার কোন কারণ নেই। অতঃপর তিনি পিতাকে সম্বোধন করে বললেন, হে পিতা! পিছন থেকে কে যেন বলছে, আপনি আমাকে কোরবানি করার জন্য নির্জন স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন। তখন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) বললেন, শয়তান তোমাকে প্রতারণা করছে। তুমি ওর প্রতি সাত খণ্ড পাথর নিক্ষেপ কর। হযরত ইসমাইল (আঃ) পিতার আদেশ পেয়ে সাত খণ্ড পাথর নিক্ষেপ করলেন। শয়তান দূরে সরে গেল। এই পাথর নিক্ষেপ হজ্ব আদায়ের জন্য একটি জরুরী শর্ত ও সুন্নত হিসেবে গণ্য হয়েছে। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) মীনা নামক এক নির্জন স্থানে গিয়ে থামলেন এবং পুত্রকে বললেন– 'হে প্রিয় পুত্র! আমি চার রাত ধরে স্বপ্নযোগে কোরবানি করার আদেশ

পেয়ে আসছি। আমি সে পরিপ্রেক্ষিতে ছয়'শ উট কোরবানি করেছি। শেষবারে আমার প্রিয় সন্তানকে কোরবানি করার আদেশ পেয়ে তোমাকে আল্লাহর নামে কোরবানি করার উদ্দেশ্যে এখানে নিয়ে এসেছি। হযরত ইসমাইল (আঃ) পিতার মুখে এ কথা শুনে বললেন, আলহাম্‌দুলিল্লাহ। আল্লাহতায়ালার এরূপ নির্দেশ আমার জন্য সৌভাগ্যের দ্বার খুলে দিয়েছেন। আমাকে আল্লাহতায়ালা কবুল করেছেন। এ জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনি এ কাজ সমাধার ক্ষেত্রে আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন। আপনি আর বিলম্ব না করে আল্লাহতায়ালার আদেশ অনুসারে কাজ আরম্ভ করুন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) বললেন, ইহা আমি কীভাবে সমাধা করব? ইসমাইল (আঃ) উত্তরে বললেন, প্রথমে আপনি আমার হাত পা বেঁধে নিন। এরপর আমাকে বিপরীত দিকে কাৎ করে শুইয়ে নিন। যেন আপনি সরাসরি আমার মুখমণ্ডল না দেখতে পান। তারপরে আমার গলদেশে ছুরি চালনা করুন, এতে আপনি অবশ্যই কৃতকার্য হবেন। তৃতীয়ত আমার রক্তে ভেজা কাপড়গুলো আমার আম্মার হাতে পৌঁছে দিবেন। তিনি এগুলো দেখে আল্লাহর রেজামন্দির উপর খুশি থাকবেন এবং আমার কথা স্মরণ করে কিছুটা স্বস্তি লাভ করবেন। কারণ, তাঁর আর কোন সন্তান নেই, যার দিকে তাকিয়ে তিনি স্বস্তি লাভ করতে পারেন।

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) পুত্রের কথা অনুসারে আস্তিনের মধ্যে রক্ষিত রশিগুলো বের করে তা দিয়ে ইসমাইলের হাত-পা বেঁধে নিলেন। অতঃপর তাকে কাৎ করে শুইয়ে নিলেন। তারপর আস্তিন থেকে ধারাল ছুরি বের করে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলে ইসমাইলের গলদেশে ছুরি চালিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর ছুরি চালনায় কোন কাজ হল না। ছুরি ইসমাইল (আঃ)-এর গলদেশের চামড়ায় কোন ক্ষত সৃষ্টি করতে পারল না। তখন ইব্রাহিম (আঃ) আরো জোরে, শক্ত করে ছুরি চালাতে লাগলেন কিন্তু না, কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল না। তখন ইসমাইল (আঃ) বললেন, পিতা আপনি ছুরির তীক্ষ্ণ মাথা টাগলার উপরে শক্তি দিয়ে চেপে ধরুন, তাহলে সম্ভবত আপনার উদ্দেশ্য সফল হবে। নবী এবার তাই করলেন কিন্তু ছুরির তীক্ষ্ণ মাথাও চামড়ার ভিতরে প্রবেশ করে না। তখন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) রাগ করে ছুরি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তখন ছুরি বলে উঠল– 'হে ইব্রাহিম (আঃ) তুমি আমাকে ইসমাইলের গলা কাটার জন্য একবার বল কিন্তু মহান রাব্বুল আলামিন আমাকে দশ বার বারণ করছেন। অতএব, তোমার কথার গুরুত্ব দিব? না আল্লাহতায়ালার কথার গুরুত্ব দিব? অতএব তুমি অন্য পন্থা গ্রহণ কর। হযরত ইসমাইল ও হযরত ইব্রাহিম (আঃ) উভয়ে ছুরির কথা শুনলেন। ইসমাইল (আঃ) তখন পিতাকে বললেন– 'হে প্রিয় পিতা! সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে জবেহ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ কাজ হয়ত আল্লাহতায়ালা পছন্দ করছেন না। অতএব আপনি কাপড় দিয়ে আপনার চোখ দুটি বেঁধে নিন, যাতে আমার চেহারা আপনি দেখতে না পান। তখন আপনার চেষ্টা অবশ্যই কাজে আসবে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ইসমাইল (আঃ)-এর পরামর্শ অনুসারে, নিজ চক্ষু দুটি বেঁধে নিলেন এবং পূর্বের মত ইসমাইলকে কাৎ করে শুইয়ে দিলেন। অতঃপর বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে ছুরি চালালেন। এবার ছুরি সহজে চলল। কলকল রবে রক্ত প্রবাহিত হয়ে জবেহ্‌র কাজ সমাধা হল।

আল্লাহতায়ালা তাঁর নবীর শেষ পরীক্ষার সফলতা দেখে সন্তুষ্ট হলেন। যার পরিণামে আল্লাহতায়ালা জিব্রাইল (আঃ) মারফত বেহেশত থেকে আনা এক দুম্বাকে জবেহ্‌র মুহূর্তে ইসমাইল (আঃ)-এর স্থলে শুইয়ে দিয়ে, ইসমাইল (আঃ)-কে একটু দূরত্বে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। যার সামান্য লেশমাত্র বোঝা নবীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) জবেহ্‌র কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে ভেবে, আলহাম্‌দুলিল্লাহ পাঠ

করলেন এবং চোখের কাপড় খুলে ফেললেন। তখন তিনি যা দেখলেন তা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাই তিনি একবার চোখ দুটি হাত দিয়ে মুছে চতুর্দিকে তাকালেন। বাস্তব দৃশ্য ভালোভাবে দেখে তিনি ক্ষণিক নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হযরত ইসমাইল (আঃ)-ও নির্বাক, তিনি পিতার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ক্ষণিক পরে পিতা পুত্রের কাছে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং দু'চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে পাঠ করলেন– সোবহানাকা আল্লাহুম্মা। অতঃপর পিতা ও পুত্র একত্রিত হয়ে শোকরানা নামাজ আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন।

এ মুহূর্তে হযরত জিব্রাইল (আঃ) সেখানে অবতীর্ণ হলেন। তিনি সজোরে উচ্চারণ করছিলেন। 'আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'। অতঃপর তিনি হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর নিকট এসে বললেন– 'হে আল্লাহর দোস্ত! আল্লাহ আপনাকে সালাম প্রেরণ করেছেন। আল্লাহতায়ালা নবীকে লক্ষ্য করে আরো বলেছেন– 'হে ইব্রাহিম! তুমি আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে তোমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছ। নিঃসন্দেহে এটা ছিল একটা মহাপরীক্ষা। আমি এভাবে আমার সৎ ও উদার বান্দাদের পুরস্কৃত করে থাকি। আমি সন্তান কোরবানির ক্ষেত্র বদল করে পশু কোরবানি দ্বারা পুরস্কৃত করেছি। এক্ষেত্রে আরো যা দিবার তা পরকালের জন্য রইল। আমি আমার সৎ, নিষ্ঠাবান বান্দাদের পুরস্কার দিয়ে থাকি। ইব্রাহিম (আঃ) আমার ঈমানদার-কৃতজাত বান্দাদের অন্যতম থাকবেন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহতায়ালার প্রেরিত সুসংবাদ শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং তাঁর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন। অতঃপর তিনি ইসমাইল (আঃ)-কে নিয়ে বিবি হাজেরার নিকট চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে হাজেরাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। হাজেরা তখন আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া আদায় করলেন।

হে সম্মানিত পাঠকগণ! সূরা সাফ্ফাত-১০২-১২ নং আয়াত পর্যালোচনা করে দেখা গেল, আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় বৃদ্ধ বয়সের নয়নমণি একমাত্র ইসমাইল (আঃ)-কে তাঁর মা-সহ মক্কায় নির্জন ভূমিতে নির্বাসনে দিয়ে আসতে তাঁর হৃদয় টলেনি। অবশেষে ঐ সন্তানকে (জবেহ্) কোরবানি করার মত কঠিনতম কাজ করতে তাঁর হাত কেঁপে উঠেনি। এ কারণে আল্লাহতায়ালা সকল পরীক্ষা নেওয়ার পরও ইব্রাহিম (আঃ)-কে, ইব্রাহিম খলিলুল্লা, আবুল আম্বিয়া, আবুল আরব, মিল্লাতে ইব্রাহিম (জাতির পিতা) ইত্যাদি লকব দান করেন। যার কারণে আমরা ঈদুল আযহায় পশু কোরবানি করি, যে সব পশু কোরবানির যোগ্য তা হল উট, দুম্বা, গরু, মহিষ, ভেড়া, বকরি। মূলত এ কোরবানির বিধানটি হযরত ইসমাইল (আঃ) থেকে চলে আসছে। মানবজাতির দেহের ভিতর যে সমস্ত রিয়া, অহংকার, তাকাব্বরী, ক্রোধ-মোহ, হিংসা, ধৈর্য্যহীনতা, নিন্দা-গীবত, আত্ম-অহমিকা, ধন-সম্পদের বাহাদুরী, অন্যায়-অবিচার, অন্যের হক নষ্ট করা, পরশ্রীকাতরতা, লোভ-লালসা এ সমস্ত খারাপ দোষ দূরীভূত করে কেউ যদি কোরবানি করে, তার কোরবানি আল্লাহতায়ালা কবুল করেন।

হে পাঠকগণ! যাদের ওপর কোরবানি ওয়াজিব হয়েছে, তারা কোরবানি করার পর গোস্ত আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, গরিব-দুঃখি ও মিসকিনদের ভিতর সঠিকভাবে বণ্টন করুন। জিলহজ মাসের চাঁদের তৃতীয় দিন ১০, ১১ ও ১২ পর্যন্ত কোরবানি করার বিধান আছে।

পবিত্র কোরআনের আলোকে উছিলা অন্বেষণ করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য অপরিহার্য

পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'ওয়া লাউ আন্নাহুম ইজ জালামু আন ফুছাহুম জায়ুওকা ফাসতাগফারু ওয়াল্লাহা ওয়াসতাগফারা ওয়ালাহুমুর রাসূলু লাওয়াজাদু ওয়াল্লাহা তাওয়াবার রাহিমা'।

অর্থ: যদি এ সকল লোক নিজেদের আত্মাসমূহের ওপর অত্যাচার করে, হে হাবীব (সঃ) আপনার দরবারে এসে হাজির হয়ে যায় এবং আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাদের পক্ষে আপনি সুপারিশ করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে এরা আমি আল্লাহতায়ালাকে তওবা কবুলকারী মেহেরবান ও ক্ষমাকারী হিসেবে পাবে' (সূরা নেসা, রুকু-৫)। এই আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল রাসুল (সঃ) প্রত্যেক গুনাহ্গারের জন্য সবসময় মাগফেরাতের উছিলা।

(সূরা মায়িদা, রুকু-৬) 'ইয়া আইয়ু হাল লাযিনা আমানু তাকুল্লাহা ওয়াবতাগু ইলাহিল অসিলাতা ওয়া জাহিদু ফি সাবিলিহি লায়াল্লাকুম তুফলিহোন'। অর্থ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহতায়ালাকে ভয় করার মত ভয় কর, আমি আল্লাহকে পাইবার রাস্তায় উছিলা অন্বেষণ কর বা তালাশ কর এবং আমার পথে কঠোর রিয়াজত সাধনা কর ও তোমার নফসের সাথে জিহাদে আকবর কর, আমি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করব। এই আয়াত থেকে প্রমাণ হয়, আমলের সঙ্গে সঙ্গে বান্দাদের উছিলা ধরা অপরিহার্য। হে রাসুল (সঃ) এসব মুসলমানদের সম্পদের সদকা গ্রহণ করুন এবং তা দ্বারা আপনি তাদেরকে পাকপবিত্র ও পরিছন্ন করবেন আর তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করুন। আপনার দোয়া হচ্ছে তাদের অন্তরের প্রশান্তি (সূরা-তওবা রুকু-১১)। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ হল সদকা, মান্নত, নজরানা ও গুরু-দক্ষিণা সৎ কর্মসূমহ পবিত্রতার যথেষ্ট উছিলা বা মাধ্যম। আর সে পবিত্রতা হুজুর (সঃ)-এর অনুগ্রহের মাধ্যম অর্জিত হয়। মহান প্রতিপালক নিরক্ষরদের মধ্যে রাসুল প্রেরণ করেছেন। রাসুল (সঃ) তাদের ওপর পরওয়ারদিগারের আয়াতসূমহ তেলাওয়াত করেন এবং তাদেরকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব কোরআন ও হিকমত শিক্ষা দেন । (সূরা জুমা, ২৮-পারা) এই আয়াত থেকে প্রমাণ হল হুজুর (সঃ) পাপীদের পবিত্র করেন। তিনি হচ্ছেন আল্লাহতায়ালার নিয়ামতসমূহের মাধ্যম বা উছিলা। 'ফাতালাক্কা আদামু মির রাব্বিহি কালিমাতিন ফাতাবা আলাইহি'। (সূরা বাকারাহ্, রুকু-৬)

অর্থ: হযরত আদম (আঃ) স্বীয় পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে কালিমা প্রার্থনা বাক্য পেয়েছেন, যেগুলো উছিলা নিয়ে দোয়া করেছেন এবং আল্লাহতায়ালা তাঁর তওবা কবুল করেছেন'।

অনেক নির্ভরযোগ্য মশহুর তাফসিরে উল্লেখ আছে– হযরত আদম (আঃ) রাসুল (সঃ)-এর নামের উছিলা দিয়ে দোয়া করেছেন যা কবুল হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, হুজুর (সঃ) সম্মানিত নবী রাসুলগণের উছিলা। যেমন তাফসিরে রুহুলবায়ানে আছে, যখন আদম (আঃ) ভুল করে বসলেন। তখন তিনি বললেন– 'ওহে আমার আল্লাহ! মোহাম্মদ (সঃ)-এর খাতিরে আমাকে ক্ষমা করুন'। আল্লাহ বললেন, আমি মোহাম্মদ (সঃ)-কে এখনও প্রকাশ করি নাই। তুমি কীভাবে তাঁকে চিনিলে?

আদম (আঃ) বললেন– ওহে আমার রব (আল্লাহ) আপনি আমাকে সৃষ্টি করলেন এবং আপনার আত্মা আমার মধ্যে দান করেছেন, তখন আরশের প্রান্তে লিখিত এই বাক্য আমি দেখেছিলাম 'লা ইলাহা ইল্লাললাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'।

আপনার প্রিয় হাবীবের নাম আপনার নামের পাশে লিখেছেন, এ বিবেচনাপূর্বক আমি বুঝেছি যে, আপনি তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। এরপর আল্লাহতায়ালা বলেন– 'ওহে আদম, তুমি সত্য বলেছো, আমার সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র তাঁকেই আমি অত্যন্ত ভালোবাসি সুতরাং তাঁর খাতিরে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম'। ইমাম আল বাই হাকি দালায়ে ও আলসীর জালিয়্যায়, এ হাদিসখানা উদ্ধৃত আছে। সুন্নি দর্শন ১০৮-১০৯ পৃষ্ঠা, প্রণেতা হুসাইন হিলমি ইসিফ। 'ইজহাব বিকামিছি হাজা ফায়াল কুহু আলা ওয়াজহি আবি ইয়াতি বাসিরা'। অর্থ: হযরত ইউসুফ (আঃ) আপন ভাইদেরকে বললেন, আমার জামা নিয়ে যাও এবং আমার সম্মানিত পিতার চেহারার (মুখমণ্ডলে) ওপর রেখে দাও, তাহলে চক্ষুদ্বয় দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইবেন। (সূরা, ইউসুফ) 'আন্নি আখলুক লাকুম মিনাত তিনা কাহাইয়াতিত তাইরে ফায়ানফাকু ফিহি ফায়ানকুন তাইরান বিইযনি আল্লাহ'। অর্থ: হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন– 'আমি মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করি, তারপর তন্মধ্যে ফুৎকার করি, যা দ্বারা সেটা পরওয়ারদিগারের হুকুমে পাখি হয়ে যায়' (সূরা আল-ইমরান)। এই আয়াত দুটি দ্বারা প্রমাণ হয়, বুজুর্গর ফুঁকের উছিলায় মাটির মধ্যে প্রাণ এসে যায়। রোগাক্রান্ত আরোগ্য লাভ করে। হে নবী, নিশ্চয় যারা আপনার নিকট বাইয়াত পড়েছেন, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হাতেই বাইয়াত পড়েছেন, আল্লাহপাকের মহান ও শক্তিশালী হাত সকল হাতের উপর রহিয়াছে। যে ব্যক্তি বাইয়াত বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, সে স্বীয় ক্ষতির জন্যেই তা করে । যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত কৃত বাইয়াত পালন করে, সে অতি সত্তরই তার অফুরন্ত পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে' (সূরা ফাতাহ)। নবীজি (সঃ)-এর পরে নায়েবে নবী পীর-মুজাদ্দিদগণের স্বীয় মুরিদগণের বাইয়াত করানোর প্রমাণ হচ্ছে, উক্ত আয়াতে কারীমা।

তাফসীরে রুহুলবায়ানে উল্লেখ আছে– কামেলপীর বা মুর্শিদ আল্লাহকে পাওয়ার উছিলা। উক্ত তাফসির ১/৫৬০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে– উছিলা ছাড়া আল্লাহর নৈকট্যলাভ করা যাবে না। নায়েবে রাসুলগণ বা হক্কানী কামেল মুর্শিদগণ হচ্ছেন এই উছিলা'।

'ইয়া আইয়ূ হাল লাযিনা আমানু তাকুল্লাহা ওয়াবতাগু ইলাইহিল উছিলাতা ওয়া জাহিদু ফি সাবিলিহি লায়াল্লাকুম তুফলিহোন' (সূরা মায়িদাহ্, রুকু-৬)। অর্থ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহতায়ালাকে ভয় করার মত ভয় কর, আমি আল্লাহতায়ালাকে পাইবার রাস্তায় উছিলা অন্বেষণ কর বা তালাশ কর এবং আমার পথে কঠোর রিয়াজত সাধনা কর ও তোমার নফসের সাথে জিহাদে আকবর কর, আমি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করব'। আরেফে কামেল শায়েখ ইসমাইল হাক্কি (রহ.) তাফসিরে বলেন– অর্থাৎ, এ পবিত্র আয়াতে উছিলা গ্রহণ করার জন্যে পরিস্কারভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং এটা অত্যন্ত জরুরী। যে সমস্ত লোক মুরিদ হয়নি, তাদের কামেল মুর্শিদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। আর যদি তার কামেল মুর্শিদ না থাকে, তবে কখনো মঙ্গল লাভ করিতে পারবে না। হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রঃ) বলেন– 'মান লাইসা লহুস শাইখূন ফা শাইখুহুস শাইত্বান'। অর্থ: যার পীর নাই, তার পীর হচ্ছে শয়তান'। আরেফে কামেল শায়েখ ইসমাইল হাক্কি (রঃ) কোরআন মজিদের আয়াতে নিম্নরূপ মত প্রকাশ করেছেন– 'আত্বীউল্লাহা ওয়া আত্বীউ'র-রাসুলা ওয়া উলীল আম্‌রি মিনকুম'। অর্থ: আল্লাহর আদেশ পালন কর, রাসুল (সঃ)-এর আদেশ পালন কর এবং সাহেবে দাওয়াত বা কামেল মুর্শিদের আদেশ পালন কর' (সূরা নিসা, আয়াত-৫৯)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন– 'অতঃপর জেনে রাখুন যে, 'উলিল আমর'-এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, কামেল পীরানে পীরগণ আল্লাহতায়ালার এলহামপ্রাপ্ত। অতএব মুরিদের উচিত যে, আল্লাহর তরফ হইতে তার আমল ও অবস্থা সম্বন্ধীয় যা কিছু এলহাম, ইঙ্গিত বা ইশারা তার কলবের মধ্যে উদয় হয়, তাকে যেন পীরের দৃষ্টির কষ্টিপাথরে যাচাই করে

নেয়। পীর যদি তাকে তার জন্য মঙ্গলদায়ক আদেশ দেন, তাহলে আজ্ঞাবর্তী হওয়া উচিৎ, আর যদি তার জন্য ক্ষতিকারক মনে করে নিষেধ করেন, তাহলে তা হতে বিরত থাকা উচিৎ। মোজাদ্দেদ বা কামেল মুর্শিদগণ ধর্ম-জগতের হেদায়েতের বাণী প্রচার করেন, তা মান্য করা অপরিহার্য কর্তব্য। 'ওয়া মিম্মান খালক্বনা- উম্মাতাই ইয়াহ্দুনা বিল্হাক্বক্বি ওয়া বিহী ইয়া'দিলূন'। অর্থ: এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় আছে যারা সৎ পথ প্রদর্শন করে থাকেন' (সূরা আরাফ, পারা-৯, আয়াত-১৮১)। কাজেই যুগে যুগে মোজাদ্দেদ, কামেল পীর-মুর্শিদগণ এ ধরাধামে এসে আল্লাহভোলা মানুষদেরকে আল্লাহতায়ালার সরল পথ দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তাঁদের আদেশ মানতে হবে, তাঁদের অনুসরণ করতে হবে নইলে হেদায়েত পাবে না। সুতরাং তারাও ধর্ম প্রচারক হিসাবে 'উলিল আমর'। দ্বীনের মোজাদ্দেদের হেদায়েত সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে, তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য। কোরআনে সূরা তওবা ১১৯ আয়াতে বলা হয়েছে– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, সদাসর্বদা সত্যবাদিদের সঙ্গী হয়ে যাও'। এই আয়াতে পীরেকামেল ও মুর্শিদে মোকাম্মেলদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার হুকুম রয়েছে। (আলকাওলুল জামীল: খোদাপ্রাপ্তির তৃতীয় তরিকা) সিদ্দিক ব্যক্তি বলতে 'পীরেকামেল' সত্যবাদিকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, তাঁরা আল্লাহতায়ালার এলহামপ্রাপ্ত মহাপুরুষ।

মহররম মাসের তাৎপর্য

আরবি হিজরী সনের প্রথম মাস 'মহররম'। মহররম মাসে আল্লাহর সৃষ্টিজগতে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে, তার মধ্যে ১০টি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এই ১০টির মধ্যে একটি হচ্ছে 'আশুরা' এই ১০ই মহররম ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা।

* আল্লাহতায়ালা এই দিনে লওহে মাহফুজ ও প্রাণীকুলের প্রাণ সৃষ্টি করেছেন।
* দুনিয়ার সমস্ত সমুদ্র-মহাসমুদ্র এবং পাহাড় পর্বত এই মহররম মাসের দশ তারিখে সৃষ্টি করা হয়েছে।
* হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহপাক মহররমের দশ তারিখে সৃষ্টি করে বেহেশতে প্রবেশ করাইয়াছেন।
* হযরত রাসুল (সঃ)-এর পূর্ব পুরুষ হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ (আঃ)-কে আল্লাহপাক মহররমের দশ তারিখে দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন।
* এই মহররমের দশ তারিখে পুত্র হযরত ঈসমাইল (আঃ)-কে আল্লাহর হুকুমে কোরবানি করার হুকুম করা হয়েছিল।
* হযরত আদম (আঃ) বেহেশত হতে দুনিয়াতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর, এই মহররমের দশ তারিখে আল্লাহতায়ালা তার তওবা কবুল করেন।
* ফেরাউন হযরত মুসা (আঃ)-এর পিছনে আক্রমণ করতে যাইয়া নীলনদে ডুবে প্রাণ হারিয়েছিল এই মহররমের দশ তারিখেই।
* হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন এই দশ মহররমের দিনটিতে।
* এই দশ মহররমে হযরত রাসুল (সঃ)-এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) কারবালার প্রান্তরে পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীসহ মোট ৭২ জন শহীদ হন।
* সর্বশেষ আল্লাহপাকের নির্দেশ অনুযায়ী মহররম মাসের দশ তারিখে হযরত ঈসরাফিল (আঃ) শিঙ্গায় ফুঁকে কেয়ামত ঘটাবেন।

এই মাসের দশ তারিখকে ইয়াওমে আশুরা বলা হয়। এই মহররমের দশ তারিখে ইয়াজিদের হুকুমে ৭২ জন ইমাম বংশের আওলাদগণকে নির্মমভাবে শহীদ করেছিলেন। এই ইয়াজিদের ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল অনৈসলামিক, পাপাচারপূর্ণ, নিষ্ঠুর, বন্য স্বভাব, অমানুষ, অধার্মিক, স্বেচ্ছাচারী এবং মনুষ্যত্ব তার ভিতরে নাই। ইয়াজিদের রাজ্যে হালাল বলতে কিছুই ছিল না, সবকিছুর ভিতরে হারাম ছিল এবং আল্লাহবিরোধী ছিল। মদ, জুয়া, ঘুষ, দূর্নীতি, জেনা ব্যভিচার ভাই-বোনদের মধ্যে বিয়ে-শাদী ইত্যাদি করাইতেন। এই সমস্ত অসামাজিক অনৈসলামিক গর্হিত কাজগুলো নিজে করে আনন্দিত হইতেন ও অন্যদেরকে করাইতেন বা করার জন্য উৎসাহিত করতেন। এ সমস্ত কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য ইয়েমেন অধিবাসী মুনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে সাবার ছদ্মবেশী ইসলামী পোশাকধারী, সে একজন ইহুদীর সন্তান ছিল। এই মুনাফেক চৌদ্দজন বিশিষ্ট গুপ্তচর দল গঠন করেন। তিনি মুসলিম রূপে আবির্ভাব হওয়ার পর ইসলামের মূল শিকড় কাটার জন্য সর্বপ্রথম পরিকল্পনা ছিল, উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-কে হত্যা করা ও অন্যান্য সাহাবিদেরসহ কোরআনের হাফেজদেরকে হত্যা করেছেন, যা এই অল্প লেখায় 'আত্মার আলো' পত্রিকায় লেখা সম্ভব হল না। কারবালায় ১০ মহররমে যে কুফাবাসী কুচক্রি ইয়াজিদের দল বাইয়াতের দাওয়াত দিয়ে ইমাম হোসাইন (রাঃ)-কে ষড়যন্ত্র করে নিয়ে যাওয়ার জন্য দাওয়াত করেন এবং হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) তাদের দাওয়াতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। কুফা শহরে যাবার সময় হোর নামক অনুতপ্তকারী কুফার পথে বাধা দিয়ে নিদারুণ মরুপ্রান্তর কারবালার দিকে নিয়ে যান।

ইমাম হোসাইন (রাঃ) জানতে পারেন তাঁর শত্রুদের পরিকল্পনা, আহলে বাইয়াত ইমাম বংশ নিপাতের পরিকল্পনা, নবী প্রেমিকদের আঘাতের পরিকল্পনা ও ক্ষমতা লোভের পরিকল্পনা। ইমাম হোসাইন (রাঃ) এলমে লাদুন্নী (জ্ঞানের) অধিকারী ছিলেন, তাই তিনি জানতে পারলেন ইয়াজিদ দল আমাকে কিছুক্ষণের মধ্যে শহীদ করিবেন। ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর পুত্র জয়নুল আবেদীনকে তন্দ্রা থেকে উঠাইয়া নিজের সিনা মোবারকে স্বজোরে চাপিয়া বা জড়াইয়া কিছু সময় ধরে রাখলেন এবং তাওয়াজ্জোহ্ এত্তেহাদি (রুহানী এলেম) প্রদান করলেন। তারপর ইমাম হোসাইন (রাঃ) আওলাদে রাসুল আহলে বাইয়াত ও সঙ্গী-সাথীদের উদ্দেশ্যে বললেন– 'তোমরা আমার এই পুত্র ইমাম জয়নুল আবেদীনকে প্রাণভরে ভক্তির সাথে আদর যত্ন করিবে। নানাজান নবী করিম (সঃ)-এর গুপ্তধন, আমার মা জগৎ জননী মা ফাতেমা, আমার বাবা হযরত আলী (রাঃ) এবং আমার ভাই হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) হইতে আমি লাভ করেছিলাম। তাই শহীদ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে ইমাম জয়নুল আবেদীনের বুকে গচ্ছিত বা আমানত রেখে গেলাম। আল্লাহতায়ালার ইচ্ছায় ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ)-এর উছিলায় নবীজির এলমে বেলায়েত 'রুহানী অনুশাসন' সিনাবসিনা হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় জারি থাকিবে। তারপর জয়নুল আবেদীনকে চুম্বন করে তাঁর ফুফু আম্মা জয়নব (রাঃ) কাছে তত্তাবধানে ছেড়ে দিলেন। নবীজির পর দুনিয়ায় আর কোন নবী আসবেন না, কিন্তু তাঁর এই বাতেনী বিদ্যা এলমে বেলায়েতের গুণে গুণান্বিত হয়ে নায়েবে নবীর (আউলিয়া কেরাম) আগমন ধারা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আর যাহারা আহলে বাইয়াতের আনুগত্য করল, তাহারা ইসলামের মধ্যে আছে। আর যাহারা আনুগত্য করল না, তাহারা ইসলাম হইতে খারিজ।

কামেলপীর চেনার উপায়

যাঁহাকে দেখিলে আল্লাহতায়ালার কথা স্মরণ হয়, মনে ভয় আসে এবং ইবাদত বন্দেগীতে মন বসে, সে-ই প্রকৃত কামেল মুর্শিদ, আউলিয়া বা আল্লাহতায়ালার খাসবান্দা।

হাদিস: হুমুল্লাজিনা ইযা-রুয়ু ওয়া উয-কুরুল্লাহা "যাহাকে দেখিলে আল্লাহতায়ালার কথা স্মরণ হয়, মনে ভয় আসে এবং ইবাদত বন্দেগীতে মন বসে, সে-ই প্রকৃত কামেল মুর্শিদ, আউলিয়া বা আল্লাহতায়ালার খাসবান্দা'।

হযরত মাওলানা খলিলুর রহমান সাহেব শামছুল আরেফিনে লিখিয়াছেন– ইহা সকল লোকের জন্য নহে। যাহাদের ভিতর আল্লাহর জিকির জারি নাই, অর্থাৎ যাহাদের দিলে আল্লাহ-আল্লাহ জিকির হয় না, তাহারা বুঝিতে পারিবে না। আর যাহাদের দিলে গাফলত (অলসতা) দূর হইয়াছে অর্থাৎ, আত্মা জিন্দা হইয়াছে তাহারাই কামেল মুর্শিদ বুঝিতে বা চিনিতে সক্ষম। আরও একটি কারণ এই যে, যাহাদের ভিতর দশগাছ রশি উত্তম ও এশকের মাদ্দা যাহাদের ভিতর বেশি, তাহারা যদি কোন অলিয়ে কামেলের প্রতি মহব্বতের নজরে দেখে, কোরআন-হাদিসের কথা শোনে, তবে অনেক সময় নবীর নূরে নবুয়তের তাছির বা অলিয়ে কামেলের দিলের ফয়েজ ওই ব্যক্তিদের দিলে পতিত হয় এবং দিলের ভিতর তাছির হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের মন ওই দিকে ঝুকিয়া পড়ে। যাহাদের ওই দশগাছ রশি সবই খারাপ তাহাদের ভিতরে এশকের মাদ্দা থাকে না। কাজেই তাহাদিগকে অলিরা যদি হাজারও বুঝায় বা উপদেশ দেয় ও কোরআন-হাদিসের কথা হাজারও শোনে, তবুও তাহাদের ভিতর তাছির হয় না। ইহাই ঠিক কথা। কারণ, রাসুলপাক (সঃ)-এর হুজুরে যাহারা আসিত, তাহাদের দিল মহব্বতে গলিয়া যাইত এবং সাথে সাথে সে মুসলমান হইয়া যাইত। কিন্তু আবু জাহেল ও আবু লাহাব প্রমুখ কাফেরগণ কখনও রাসুলুল্লাহর গুণ বুঝিতে পারে নাই। এ জামানার লোকের অবস্থাও তদ্রূপ হইবে। পীরকামেলের নাম শুনিয়া কত লোক ফয়েজে বে-এখতিয়ার (অস্থির) হইয়া যায়, আবার এমন লোকও আছে, যাহারা কামেল লোকের চেহারা দেখিয়াও তাহাকে বিশ্বাস করে না ও তাহাকে শত-সহস্রবার বুঝাইলেও বুঝ নেয় না। জাকের সকল সহজেই বুঝিতে পারে যে, মিথ্যা কথা বলিলে, হারাম খাদ্য আহার করিলে বা অন্যান্য পাপের কাজ করিলে দিল বন্ধ অর্থাৎ, আল্লাহর জিকির বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া যায় এবং ফয়েজ বন্ধ হইয়া যায়। আর যে সমস্ত লোক আজীবন হারাম খাদ্য আহার করিয়া বা নানা প্রকার গুনাহর কাজ করিয়া দিল কঠিন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারা কী প্রকারে মুর্শিদে কামেল চিনিতে পারিবে? যিনি কামেল-মোকাম্মেল পীর হইবেন, শরিয়ত ও মারেফতের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকিতে হইবে। কমপক্ষে শরিয়তের বিধানসমূহ ভালরূপে জানা থাকিবে এবং এলমে লাদুন্নাতে তাঁর পূর্ণ অধিকার থাকিবে। শরিয়তের আদেশ নিষেধ পালন ও তদনুযায়ী কাজ করিবেন। শরিয়ত বিরোধী কাজ হইতে দূরে থাকিবেন। খোদাতায়ালাকে ভয় করিবেন ও মুত্তাকী হইবেন এবং পরহেজগার হইবেন। কামেল বা মোকাম্মেল পীরের ভিতর এই তিনটি গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক। পীরের নিকট হইতে ছবকসমূহ আয়ত্ত করা, ফয়েজ হাসিল করা ও মুরিদদের ভিতর ফয়েজ পৌঁছানোর ক্ষমতা থাকা। যিনি কামেল হইবেন তিনি লোভ শূন্য হইবেন। কেননা লোভী ব্যক্তি কখনও ফকির হইতে পারে না। 'কওলোল জামিল' কিতাবে আছে, অনেকে মনে করে থাকেন যে, বার মাস রোজা রাখিতে হইবে, স্ত্রী হইতে দূরে থাকিতে হইবে, খানা খাইবে না ও জঙ্গলবাসী হইতে হইবে আসলেই এই সব শর্ত নহে। রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর জামানায় যেমন অজদ, গোলবা, ছুকুর ও বেখোদী ইত্যাদি নানা প্রকার জজ্‌বা ছিল,

কামেল পীরের মুরিদানের মধ্যেও রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর জামানার ন্যায় মাঝে মাঝে দুই এক জনের ওই সকল হালত হইবে। কেননা আউলিয়াগণ রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর গুণ পাইয়া থাকেন। আহ্ইয়া উলুমউদ্দিন কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডে অজদের বয়ান দেখুন যে, আসহাবগণের কীরূপ অজদ হইয়াছিল। এই জামানার মুমিনগণের তাহাদের চেয়ে (১) ছবুরের শক্তি শত শত গুণে কম। কাজেই এ জামানার জিকিরকারীগণের তাহাদের চেয়ে শত শত গুণে বেশি বেকারার (অস্থির) হওয়ার কথা।

বর্তমানে ভণ্ড পীর হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, একদল নামধারী পীর আছে, তারা 'আমেল সিফলি' আমলিয়াতের সাহায্যে জিন-পরী আবদ্ধ করিয়া ও কিছু বইপুস্তক পড়িয়া, পানি পড়া, তাবিজ-কবজ, ঝাড়ফুঁক ও কুফরি কাজের দ্বারা যাদু-টোনা-বান করিয়া উহার সাহায্যে জনসাধারণের (অশিক্ষিত মূর্খ লোকের) নিকট ছদ্মবেশী পীর সাজিয়া রুজির পথ করিয়া থাকে। আর ভিতরে ভিতরে নানা প্রকার পৈশাচিক কার্য করিয়া থাকে। আর বলিয়া বেড়ায়– রোজা নামাজ কিছু না, এই সকল ইবাদতের কোন আবশ্যক নাই। আমার নিকট মুরিদ হইলে এই সকল ইবাদত করা লাগবে না। এবং এ সম্বন্ধে নানা প্রকার কুতর্ক করিয়া থাকে। ইবাদতের দায় হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে ভাবিয়া, অনেক জাহেল অশিক্ষিত লোক তাহাদের মুরিদ হইয়া থাকে। কেবল গানবাদ্য, গাজা, নেশা তাহাদের ইবাদত মনে করে থাকে। বে-শরা লোকদিগকে কখনও কামেল বলিয়া বিশ্বাস করিতে নাই। তীর যেমন ধনুক হইতে যত দ্রুত চলে যায়, তার চেয়েও দ্রুত চলে যাওয়া একান্ত আবশ্যক। কিতাবে আছে, কেহ যদি বাতাসের ওপর দিয়া উড়িয়া যায়, অগ্নির ভিতরে বসিয়া থাকে বা পানির উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়, আর যদি সর্বদা সে শরিয়তের (১) খেলাফ কার্য করে তবুও তাহাকে বিশ্বাস করিও না। বর্তমানে আর একদল আলেম ও মৌলভী আছে, তাহারা কয়েক বছর মাদ্রাসায় পড়িয়া রুজির কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে কোন রাস্তা গতি না পাইয়া, একটা ঘর ভাড়া করে খানকা শরীফ নাম দিয়া, তাসাউফের দুই একটি কথা শিক্ষা নিয়া পীর সাজিয়া থাকে এবং পাগড়ি জোব্বা পড়ে; বেশভূষা পরিয়া বলিয়া বেরায়– আমি কামেল মুর্শিদ, কামেলপীর। কোন স্থানে কামেলপীরের মুরিদের মধ্যে অজদ, গোলবা, ছুকুর ও বেখোদী ইত্যাদি হালতের লোক দেখিলে নানা রকম ঠাট্টা ও বদনাম করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা পীর-মুরিদীর কিছুই জানে না। কেন না পূর্বেই বলা হইয়াছে, একদল পীর আছে, তাহারা পীরের নিকট গিয়া দুই একটি ছবক নিয়া পীরের এজাজত ছাড়াই ও পীরের খেলাফত ছাড়াই পীর সাজিয়া মুরিদ বানাইতেছে। তাহাদের শিক্ষায় ফয়েজ নাই, মুরিদের দিল জিন্দা নাই, অজদ, গোলবা ছুকুর ইত্যাদি মূল জিনিস কিছুই নাই, কারণ তাহাদের তাওয়াজ্জোহ দেওয়ার ক্ষমতা নাই। কেননা পীরের বিনা হুকুমে ও বিনা খেলাফতে পীর সাজিয়াছে। স্বামী ছাড়া যেমন স্ত্রীর সন্তান আসে না, তেমনি কামেল মুর্শিদের পায়রুবি ছাড়া কামেলপীর হইতে পারে না।

বর্তমান সময়ে আর একদল পীর দেখিতে পাওয়া যায়, তারা শরিয়তী পীর দাবী করিয়া থাকে। তাহাদের ভিতর জাহেরাতে শরিয়তের কোনপ্রকার ত্রুটি দেখা যায় না। ফেটা পাগড়ি জোব্বা সবই আছে মূলত তাদের এলমে লাদুন্নী বা মারেফতের জ্ঞান নাই। তারা জানে না যে, ইমাম মালেক (রহ.) বলেন– যে শুধু শরিয়ত করে সে ফাসেক, আর যে শুধু মারেফত করে সে জিন্দিক বা কাফের। তাহারাই পীর-মুরিদ করিয়া আসিতেছে। মোটকথা জাহেরাতে তাহাদের ভিতর শরিয়তের বা পীর মুরিদীর কোনপ্রকার ত্রুটি দেখা যায় না। কিন্তু কামেল পীরদের মুরিদের মধ্যে যে সকল বুঝ খুলিয়া যায়, তাহাদের মুরিদের ভিতর সে সব কিছুই নাই। তাহাদের মুরিদেরা এই বুঝে যে, দোয়া দরূদ শিক্ষা

করা এবং জাহেরা-শরিয়ত মত চলা, এই বুঝি আল্লাহ পাওয়ার পথ, এই পর্যন্ত মারেফাতের সীমা। তাহাদের শিক্ষায় মুরিদের দিল জিন্দা হয় না। তাহাদের মুরিদের ফয়েজ সম্বন্ধে জ্ঞান নাই অজদ ও গোলবা ইত্যাদি প্রায় চল্লিশ প্রকার জজ্‌বা আছে, কিন্তু তাহাদের মুরিদগণের কোনপ্রকার জজ্‌বা সম্বন্ধে জ্ঞান নাই। রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর (মিয়াণে আশেক ও মাশুক রমজিস্‌ত কেরামিন কাতেবীনরা খবর নিস্ত) জামানায় যে সাহাবাদের প্রায় চল্লিশ প্রকার জজ্‌বা ছিল, তাহাও তাহারা স্বীকার করিতে চাহে না। এমনকি যদি কোন কামেল পীরের মুরিদের ভিতর দুই একজনের জজ্‌বা দেখে, তবে তাহাদিগকে ঠাট্টা করিয়া বেড়ায়, আর বলে ইহারা বে-শরা কাজ করিয়া থাকে। ইহারা শরিয়ত মত চলে না। কেহ কেহ নানা প্রকার অকথ্য ভাষায় গালিও দিয়া থাকে। আর গর্ব করিয়া থাকে, আমরা শরিয়তী পীর ধরিয়াছি, আমাদের কাহারও এই প্রকার হয় না। দুঃখের বিষয় এই যে, পীরসাহেবও রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর জামানার কথা ভুলিয়া যান এবং বলিয়া থাকেন রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর জামানায় এ সব জজ্‌বা ছিল না। কিন্তু বর্তমান আক্ষেপের বিষয় রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় যে জজ্‌বা বহুগুণে বেশি ছিল তাহা পীরসাহেবেরও জানা নাই! অনেক পীরসাহেব জজ্‌বা সম্বন্ধীয় কিতাবাদী পড়েন-ই নাই, আর কোন পীরসাহেব আছে, তাহাদের মুরিদের ভিতর ওই সকল হাল্‌ত বা জজ্‌বা নাই বলিয়া রাসুলুল্লাহর (সঃ)-এর জামানার সাহাবিদের জজ্‌বার বিষয় ধামাচাপা দিয়া আসিতেছে। মোট কথা যে সকল পীরেরা জয্‌বা চিনে না বা যে সকল পীরের মুরিদের মধ্যে জয্‌বা মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাদের হইতে দূরে থাকা কতর্ব্য, কেননা তাহারা নাকেচ পীর ও বাতিল পীর।

সম্রাট আকবর ও বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মনগড়া দ্বীন-ই-এলাহী প্রসঙ্গে

বেদাত শিরকী ও কুফরী মতবাদ নস্যাৎ করে ইসলামকে পুনর্জাগরণ করেন হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.)।

বিশাল মোঘল সাম্রাজ্যের শতকরা পচাঁনব্বইজন ছিল হিন্দু। তাহারা সবাই ছিল বাদশাহর পক্ষে। এছাড়া দুনিয়াদার আলেম-ভণ্ড-সূফীকুল, শিয়া প্রভৃতি গোষ্ঠিও বাদশাহর হাতকে শক্তিশালী করিয়াছে। জৈন-পারসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদেরও ছিল বাদশাহের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন। সুতরাং বাদশাহ নির্বিঘ্নে ইসলামবিরোধী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া যাইতে লাগিলেন। সমগ্র হিন্দুস্থানে ইসলামের এই ঘোর দুর্দিনে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী শায়েখ আহমেদ ফারুকী শেরহিন্দি (রহ.), তাঁহার মুজাদ্দিদসুলভ প্রজ্ঞা ও দৃঢ় সংকল্প লইয়া সংস্কারের কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বেদাত ও কুফরীর যাঁতাকলে পিষ্ট ইসলামের ভয়াবহ দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার (ফারুকী) রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। তাই প্রথমে তিনি বাদশাহর এসলাহ প্রয়োজন মনে করলেন। বাদশাহর এসলাহর পূর্বে তার আমীর-ওমরাহগণের এসলাহর কার্যে নিয়োজিত হলেন। খান খানান, খানে আজম, সৈয়দ ছদরে জাহান, মোর্তজা খান, মহব্বত খান প্রমুখ ওমরাহ পূর্ব হইতেই হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.)-এর মুরিদ ছিলেন। তিনি তাঁহাদের দ্বারা বাদশাহ আকবরকে এইসব কুফরী কার্যকলাপ হইতে তওবা করিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। মুর্শিদের কথামত ওমরাহগণও বাদশাহ আকবরকে নানাভাবে বোঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলো না। শিরক-কুফরীর প্রভাবে তাহার অন্তর পাষাণ হইয়া গিয়াছে। হেদায়েতের নূর সেখানে প্রবেশ করিতে পারিল না। বাদশাহ স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল রহিলেন।

একদিন বাদশাহ একটি অশুভ স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্ন তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। রাজ্যের সমস্ত স্বপ্ন ব্যাখ্যাবিদ ও জ্যোতিষীগণকে তিনি স্বপ্নটির বিষয়বস্তু জানাইলেন এবং উহার অর্থ জানিতে চাহিলেন। তাহারা বাদশাহকে জানাইলেন– এই স্বপ্নের অর্থ হইতেছে যে, বাদশাহর পতন অতি সন্নিকটে। বাদশাহ স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনিয়া ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি দমিয়া গেলেন। নতুন করিয়া ফরমান জারী করা হইল যে, পূর্বে দ্বীন-ই-এলাহী পালনের ব্যাপারে যে বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা হইত, এখন হইতে উহা থাকিবে না। যাহারা সেজদা করিতে উচ্ছুক নয়, তাহাদিগকে বাদশাহর তরফ হইতে সেজদা করিবার জন্য জবরদস্তি করা হইবে না। কিছুদিন পর বাদশাহ আকবর এক উৎসবের আয়োজন করিলেন। উৎসবের দুইটি দরবার নির্মিত হইল। একটি নাম রাখা হইল আকবরী দরবার এবং অপরটির নাম রাখা হইল মোহাম্মদী দরবার। আকবরী দরবার প্রস্তত করা হইল বহু অর্থ দিয়ে। চোখ ঝলসানো আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হইল। সুসজ্জিত মনোরম মঞ্চ নির্মিত হইল। নিমন্ত্রিত অতিথিদের উপবেশনের জন্য প্রস্তত করা হইল জৌলুসময় গালিচা। পুষ্পের সৌরভ, আতরের সুঘ্রাণে আকবরী দরবার পরিণত হইল ছোট-খাট শাদ্দাদের বেহেশতে। শাহীখানার ব্যবস্থা করা হইল। অপরদিকে মোহাম্মদী দরবারের অবস্থা ছিল বড়ই করুণ, ছিন্ন তাবু, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ফরাস দিয়া নির্মিত হইল এই দরবার। খাবারের ব্যবস্থা করা হইল নিকৃষ্ট মানের। আলোকসজ্জার ব্যবস্থা নাই। নিতান্ত মামুলী সাধারণভাবে নির্মিত এই দরবারটিকে আকবরী দরবারের নিকট জীর্ণ-শীর্ণ কুঁড়েঘর মনে হইতে লাগিল। এইরূপ করার মূলে বাদশাহ আকবরের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মানুষ দেখুক ও জানুক

ইসলামের কার্যকারিতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, জীর্ণ-শীর্ণ এই ধর্ম বর্তমান যুগে অচল। দ্বীন-ই-এলাহী শান শওকতময় ও যুগোপযোগী ধর্ম। এখন আর কাহারও এ বিষয়ে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। মনে-প্রাণে সবারই নতুন ধর্মে দাখিল হওয়া উচিত।

উৎসবের দিন আসিল। নির্দিষ্ট সময়ে বাদশাহ আকবর তাহার পারিষদবর্গ, আমির ওমরাহ ও বিশিষ্ট অতিথিগণকে সঙ্গে লইয়া মহাসমারোহে তাবুতে প্রবেশ করিলেন। লোভী দুনিয়াদার লোকেরাও তাহার অনুসরণ করিল। আনন্দে উল্লাসে মুখরিত হইয়া উঠিল আকবরী দরবার। এমন সময় হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.) তাহার মুরিদানসহ সেখানে আগমন করিলেন। তাহার বুঝিতে বাকি রইল না, কী উদ্দেশ্যে এই উৎসবের আয়োজন এবং কেন-ই বা এই দুই দরবারের সাজ-সজ্জার মধ্যে এইরূপ আকাশ-পাতাল ব্যবধান। মুসলমানদের অপদস্থ ও কোনঠাসা করা ছাড়া এইসব অর্থহীন কার্যকলাপের আর যে কোনই উদ্দেশ্য নাই, তা তাঁহার অবিদিত রহিল না। কিন্তু মানসম্মান-ইজ্জত নিজের অর্জিত সম্পদ নয়। ইহা আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামত। হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) তাঁর মুরিদান ও কিছু দরিদ্র মুসলমানসহ মোহাম্মদী দরবারে প্রবেশ করিলেন। আহারের সময় হইল। এমন সময় হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) তাঁর এক মুরিদের হাতে লাঠি দিয়া বলিলেন, যাও এই লাঠি দিয়া তুমি মোহাম্মদী দরবারের চতুর্দিকে একটি বৃত্তাকার দাগ দিয়া আস। উক্ত মুরিদ তাহার কথা মত লাঠি দিয়া দরবারের চর্তুদিকে বৃত্তাকার দাগ দিয়া ফিরিয়া আসিলেন, তিনি তাহার হাতে এক মুষ্টি ধূলি দিলেন এবং বলিলেন, এইবার বাহিরে গিয়া এই ধূলি আকবরী দরবারের দিকে ছুঁড়িয়া মার। মুরিদ আকবরী দরবারের দিকে ধূলি ছুঁড়িয়া মারিলেন। মুহূর্তের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ভয়ঙ্কর তুফান শুরু হইয়া আকবরী দরবারকে ঘিরিয়া ফেলিল। দরবারে মহা ধুমধাম চলিতেছিল। হঠাৎ তুফান দেখিয়া সবাই ভয় পাইয়া গেল। কী করিবে বুঝিয়া উঠিবার আগেই তাবু উড়িয়া গেল। আসবাবপত্র, সাজ-সজ্জা, খাদ্যসামগ্রী সমস্তই তছনছ হইয়া গেল। নিমন্ত্রিত অতিথিগণ একে অন্যের উপরে গড়াইয়া পড়িয়া ধস্তাধস্তি শুরু করিল। তুফানে তাবুর খুঁটিগুলি উপড়িয়া উঠিল এবং তাহাদের আঘাত করিতে শুরু করিল। একটি খুঁটি উপড়ে গিয়া বাদশাহর মস্তকে পর পর সাতটি আঘাত করিল। পাশে মোহাম্মদী দরবার। আল্লাহপাকের কী অপার মহিমা! মোহাম্মদী দরবারে তুফান এতটুকুও স্পর্শ করিল না। দরবারের সবাই হজরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.)-এর এই কারামত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাহারা সবাই আল্লাহপাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করিলেন।

মস্তকে সাতটি আঘাত খাইয়া বাদশাহ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তিনি শয্যা হইতে আর উঠিতে পারিলেন না। আঘাত বড়ই মারাত্মক হইয়াছিল। কয়েকদিন পরেই বাদশাহ মৃত্যুবরণ করিলেন। সুদীর্ঘ ৫০ বছর রাজত্ব করিবার পর বাদশাহ আকবর মৃত্যুবরণ করিলেন। দিল্লির মসনদে সমাসীন হইলেন পুত্র জাহাঙ্গীর। কিন্তু আকবর তাহার জীবদ্দশায় হুকুমতের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং রাজ্যব্যাপী দ্বীন-ই-এলাহীর ভ্রান্ত ধর্মীয় মতবাদের যে প্রভাব রাখিয়া গিয়াছিলেন, বাদশাহ জাহাঙ্গীর তা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.) মোঘল সাম্রাজ্যের হুকুমাত হইতে এই শয়তানী শক্তি নির্মূল করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। বাদশাহ বদল করিলে কাজ হইবে না। বাদশাহর এসলাহ্ করিতে হইবে। তাহার জন্য সর্বপ্রথমে এসলাহ্ করিতে হইবে হুকুমতের আমির ওমরাহগণের। কারণ, তাহাদের এসলাহ্ ব্যতিরেকে বাদশাহর এসলাহ্ স্থায়ী হইবে না। হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) তাই ইসলামী আইন-কানুন আক্বিদার প্রতি উৎসাহিত করিবার জন্য খানে আজম, লালাবেগ, খান জাহান, কলীজ খান, শায়েখ ফরিদ প্রমুখ দরবারীদের সহিত যোগাযোগ করিলেন। ক্রমে ক্রমে আবদুর রহিম খান

খানান, খান জাহান, সদরে জাহান, খানে আজম, খাজা জাহান, মীর্জা দারাব, কলিজ খান, নবাব শায়েখ ফরিদ, হাকিম ফাতহুল্লাহ, শায়েখ আবদুল ওয়াহহাব, সেকান্দার খান লোদী, খেজের খান লোদী, জব্বারী খান, মীর্জা বদিউজ্জামান, সৈয়দ মাহমুদ, সৈয়দ আহমদ প্রমুখ ব্যক্তি মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রহ.)-এর দলভুক্ত হইলেন। তিনি তাহাদের নিকট নকশবন্দিয়া তরিকার শ্রেষ্ঠত্ব, বেলায়েত, নবুয়ত, সুন্নতের অনুসরণ, কলবের সুস্থতা, নফসে আম্মারার স্বভাব ও তার অনিষ্ট হইতে মুক্ত হইবার উপায় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অবগত করাইয়া তাহাদিগকে এসলাহ্ করিলেন। ফলে হুকুমাতের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইতে বেদাত ও বেদাতসুলভ মনোভাব দুরীভূত হইল। মনে-প্রাণে এই দল হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.)-এর নির্দেশে বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর আমীর ওমরাহগণের মুখে সত্য পথের সন্ধান পাইয়া শরিয়ত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন।

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.) সেনাবাহিনীর মধ্যেও ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন। সেনাবাহিনী হুকুমাতের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই অংশে এসলাহ্ হওয়াও জরুরী। তিনি শায়েখ বদিউদ্দিন (রহ.)-কে সেনাবাহিনীর মধ্যে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বিদা বিশ্বাস, নকশবন্দিয়া তরিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি বিষয় প্রচারের জন্য নিযুক্ত করিলেন। উদ্দেশ্য সফল হইল। ক্রমে ক্রমে সেনাবাহিনীর এক বিপুল অংশ হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.)-এর ভক্ত হইয়া উঠিল এবং অনেকেই তাঁর মুরিদ হইলেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর সংস্কারকার্য পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। দ্বীনের মধ্যে ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টির যত রকম উৎস ছিল, প্রতিটির মুখেই তিনি শক্ত বাধ দিতে লাগিলেন। ছোট-বড়, সূক্ষ্ম-স্থুল সর্বপ্রকার বেদাত তিনি তাঁর মুজাদ্দিদসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচক্ষণতার সাহায্যে উদ্ধার করিলেন। নিপূণ চিকিৎসকের মতো সেইসব ব্যাধির প্রতিষেধক প্রয়োগ করিলেন। বিভিন্ন কৌশলে হেকমতের আলোকে তিনি সর্বপ্রকার বেদাত ও তাহাদের অনিষ্টসমূহ এমনভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যাহাতে সত্য-মিথ্যার প্রভেদ না বুঝিবার কোন কারণ অবশিষ্ট রহিল না।

শুধু হিন্দুস্তানেই নয়, হিন্দুস্তানের বাহিরে মা'অরা উন্নাহার, বদখশান খোরাসান, তুরা প্রভৃতি স্থানেও তিনি খলিফা নিযুক্ত করিলেন। সমস্ত খলিফাগণই ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শী এবং বিচক্ষণ। তাহারা দ্বিতীয় হাজার বৎসরের মুজাদ্দিদ-এর সংসর্গের ফজিলতে এক একটি রত্নে পরিণত হইয়াছিলেন এবং ইসলাম প্রচারের জন্যে নিজের জীবনকে কোরবান করিয়াছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.)-এর মকতুবসমূহ বিভিন্ন খলিফাগণের নিকট পৌঁছিতে লাগিল এবং তাহারা দ্বীন ইসলামের ভিতরে দীর্ঘদিন ধরিয়া পুঞ্জিভূত কুফরী আক্বিদাসমূহ ধ্বংস করিয়া সেই স্থলে সত্য ইসলামের নূর প্রজ্বলিত করিতে লাগিলেন।

দার্শনিকদের ভ্রান্ত মতবাদজনিত ফেৎনা, জাহেল শ্রেণির মুসলমানগণের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণির কুফরী, রসুমাত এর কোন কিছুই হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.)-এর দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। বাদশাহ জাহাঙ্গীর এই খবর পাইয়া মুজাদ্দিদ (রহ.)-কে তাহার দরবারে উপস্থিত হইবার আমন্ত্রণপত্র পাঠাইলেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) আমন্ত্রণপত্র পাইলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁহাকে দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য যে আমন্ত্রণ পাঠাইলেন, তা মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.) পূর্বেই তাঁর বাতেনী কাশ্‌ফ দ্বারা অবগত হইয়া ছিলেন। বাদশাহ ও তাহার দরবারীগণের একাংশ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাহারা তাঁকে কতল করিতে চায়। সামনে বিপদ এবং এই বিপদ আল্লাহপাকের ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পাদিত হইবে। ইহার মধ্যে যে অনেক হেকমত, অনেক

রহস্য। আপাতদৃষ্টিতে বিপদ মনে হইলেও ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে প্রকৃত বিজয়। আল্লাহপাক সর্ববিষয়ে অধিক জ্ঞানী। তিনি মুমিনদের প্রতি বড়ই দয়াবান।

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.) তাঁর পাঁচজন বিশিষ্ট খলিফাসহ শাহী দরবার অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। রাজধানীতে পৌঁছিয়া তিনি উজির আসফ খান-এর নিকট তাঁর আগমণ সংবাদ প্রেরণ করিলেন। আসফ খান তাহার অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইল। সে চিন্তা করিয়া ঠিক করিল, যে সময়ে বাদশাহর মেজাজ সাধারণত: উগ্র থাকে, সেই সময় হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর সহিত তাহার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে অতি সহজেই সামান্য কোন বিষয় লইয়া দুইজনের মধ্যে দ্বন্দ সৃষ্টি হয়। তাহা-ই হইল। বাদশাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট। বিভিন্ন কারণে মেজাজ তাহার উগ্র। এমন সময় দরবারে প্রবেশ করিলেন হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) কিন্তু দরবারে প্রবেশ করিয়া সেজদা তো দূরের কথা, বাদশাহকে তিনি সালামও জানাইলেন না। বাদশাহ ক্ষিপ্ত হইলেন। প্রশ্ন করিলেন, আপনি দরবারের শৃঙ্খলা রক্ষা করেন নাই। হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.) বলিলেন, কী রূপে? আপনি সেজদা করেন নাই, সালামও দেন নাই। আপনার দরবারে সালাম দিবার প্রথা নাই। সে কারণে সালাম প্রদান হইতে বিরত রহিয়াছি। আর সেজদা তো একমাত্র আল্লাহর জন্য। ইহা তাজিমি সেজদা। হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) দৃঢ় তেজোদীপ্ত স্বরে বলিলেন, আমার মাথা মানুষের সামনে নত হয় না। বাদশাহ অপ্রতিভ হইলেন। কী আশ্চর্য সাহস এই ফকিরের! হইবে না কেন? আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রহ.)-এর রক্ত যে তাঁর প্রতিটি শিরায় প্রবাহমান। বাদশাহ ক্ষণকাল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) এর প্রতি। ঈমানের তেজ আর ফকিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার অন্তর মুগ্ধ হইয়া গেল। তিনি ক্ষিপ্ততা পরিহার করিয়া সাধারণভাবে বলিলেন, বেশ আপনার জন্য পূর্ণাঙ্গ সেজদার হুকুম উঠাইয়া লওয়া হইল। আপনি শির সামান্য নত করিলেই আমি সন্তুষ্ট হইব। হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর সমস্ত অবয়বে ফারুকী দৃঢ়তা। পূর্বের ন্যায় এবারও তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, অসম্ভব। বাদশাহর শাহী মর্যাদায় প্রবল আঘাত লাগিল। এই বিশাল হিন্দুস্তানের একচ্ছত্র অধিপতি তিনি। তাঁহার সামান্য অঙুলী হেলনে এই রাজ্যে দিন-রাত্রিতে পরিণত হয়, রাত্রি হয় দিন। আর ইহাকে আদেশ নয়, ইহাকে তো সামান্য আবদারও বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহারও কোন মূল্য রহিল না। মোঘল দাম্ভিকতা বাদশাহকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি প্রবল রোষভরে হুকুম দিলেন, ইহাকে মস্তক জোর করিয়া নত করাইয়া দাও। অনেক লোক বাদশাহর হুকুম প্রতিপালনে আগাইয়া আসিল। তাহারা অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.)-এর মস্তক এতটুকুও অবনত করাইতে পারিল না। এই দৃশ্য দেখিয়া বাদশাহর ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। দরবারীগণ পরামর্শ দিলেন, কতল করিবার হুকুম দিন জাঁহাপনা। এইরূপ ঔদ্বত্য কিছুতেই বরদাশত করা যায় না। বাদশাহ কোন হুকুম দিলেন না। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, ইহাকে কয়েদ করিয়া গোয়ালিয়র কেল্লায় প্রেরণ করা হউক।

আল্লাহতায়ালার নবীগণ ও রাসুল (সঃ) বিস্ময়কর সৃষ্টি। যুগে যুগে তাঁরা ভ্রান্ত মানবকে পথের দিশা দেখাইতে গিয়া কতইনা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। বিভ্রান্ত মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ কামনায় তাঁরা প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেন, অথচ তাহারাই তাঁহাদিগকে ভুল বুঝিয়া অথবা হিংসা বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার করিতে থাকেন। হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) উলুল আজম পয়গম্বরগণের কামালতবিশিষ্ট মুজাদ্দিদ। তাই তাঁর চরিত্র নবীসুলভ। গোয়ালিয়র কেল্লায় বন্দি হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে বদদোয়া করিলেন না। বরং আল্লাহপাকের ইচ্ছার প্রতি পরিপূর্ণরূপে সন্তুষ্টি রহিলেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)ও কারাবরণ করিয়াছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) তাঁহার সুন্নত প্রতিপালনের তৌফিক পাইয়া আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করিলেন। নতুন পরিবেশ, অদ্ভুত পরিবেশ। এখানে শুধু বন্দি আর বন্দি। শত শত চোর, ডাকাত ও অন্যান্য সামাজিক দুষ্কৃতকারীরা তাহাদের অপরাধের দায়ে বন্দি জীবন কাটাইতেছেন। কী উচ্ছৃঙ্খল তাহাদের জীবন! শয়তানের চক্রান্তে পড়িয়া তাহারা বিভ্রান্তির অগ্নিতে পুড়িয়া পুড়িয়া মরিতেছে। পথ দেখাইবার কেহ নাই, ভালো কথা বলিবার কেহ নাই, সান্তনা দিবার কেহ নাই। মানবতার এই চরম অধঃপতন দেখিয়া হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.)-এর অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। তিনি সমাজের চোখে এইসব ঘৃণিত ব্যক্তিদের এসলাহ্ করিবার কার্যে হাত দিলেন। ইহা তো তাঁরই কাজ। বন্দিদের বেশির ভাগই ছিল কাফের। হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) তাহাদেরকে ইসলামের নূরের সন্ধান দিলেন। পুষ্পের সৌরভ কখনও চাপা থাকে না। মুজাদ্দিদ কুসুম ও সৌরভ ছড়াইতে লাগিলেন। সত্যের সৌরভে বন্দিগণের অন্তর ভরিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তাহারা ইসলামের সুবাসিত হাওয়ায় প্রাণ ভরিয়া নিঃশ্বাস লইতে শুরু করিল। বন্দিশালা পরিণত হইল ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রে।

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.)-এর কারাবরণের সংবাদ ধীরে ধীরে সমস্ত খলিফা, মুরিদান ও ভক্তগণের নিকট পৌঁছিতে লাগিল। প্রিয় মুর্শিদের এই কষ্ট দেখিয়া সবারই অন্তরে ক্ষোভের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে বাদশাহর সহিত যোগাযোগ করিয়া মুজাদ্দিদ (রহ.)-কে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। খলিফাগণের মধ্যে কেহ কেহ বদদোয়া করিবার এজাজত চাহিয়া তাঁর নিকট পত্র লিখিলেন। কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.) কিছুতেই এজাজত দিলেন না। তাঁর ছোট সাহেবজাদা হযরত মোহাম্মদ মাসুম (রহ.), মীর মোহাম্মদ নোমান (রহ.), শায়েখ বদিউদ্দিন (রহ.) প্রমুখ খলিফাগণকে তিনি বিভিন্নভাবে এই কারাবরণের প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করিয়া সারগর্ভ নসিহতের মাধ্যমে প্রত্যেককেই, আল্লাহপাকের ইচ্ছার প্রতি পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকিবার নির্দেশ দিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.)-এর কারাজীবনের কার্যকলাপের সংবাদ বাদশাহর নিকট পৌঁছিতে লাগিল। তিনি শুনিলেন, হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) কারাগারের অপরাধী কাফেরগণকে মুসলমান বানাইতেছেন। তাঁর খলিফাগণকে তিনি কোন প্রকার বদদোয়া করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন। এমনকি কারাজীবনের বিন্দু পরিমাণ প্রতিক্রিয়াও তাঁর উপর পড়ে নাই। বরং ইহাকে আল্লাহপাকের ইচ্ছা মনে করিয়া খুশি হইয়াছেন। বাদশাহ তাহার শেরহিন্দের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার হুকুম দিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি পুত্রপরিজনদের প্রতি এই কারণে অসন্তুষ্ট হইতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি নাকি বলিয়াছেন, এই সমস্ত অস্থায়ী বস্তুর মূল্য এমন কিছু নয়, যাহার জন্য হৃদয় বিচলিত হইতে পারে। বাদশাহ ভাবিলেন, এই মানুষটি কী? প্রতিশোধ গ্রহণের তাহার ওপর বিন্দু পরিমাণ ইচ্ছা নাই। অথচ ইচ্ছা করিলেই তিনি এখন রাজ্যময় লক্ষ লক্ষ মুরিদানের সাহায্যে বিরাট বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে পারেন। বাদশাহ বিস্মিত হইলেন। তবে কি আসফ খানের দলের লোকজনের আশঙ্কা মিথ্যা? হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) সত্যিই তাহার অমঙ্গল কামনা করেন নাই? বাদশাহ ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি তিনি অন্যায় করিয়াছেন? আল্লাহর ফকিরকে অন্যায়ভাবে কয়েদ করিয়াছেন? এবং তাহাদিকে পরাজিত করাও সহজ হইবে। কিন্তু বাদশাহ এই সিদ্ধান্তে রাজী হইলেন না। কারণ, তাহা হইলে বিদ্রোহীগণ আরও বেশি ক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে এবং সাম্রাজ্যব্যাপী চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবে। ইহাতে পরিস্থিতি হয়তো নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাইবে। তাই সর্বপ্রথম মহব্বত খানের দলকে পরাভূত করিবার পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত করিতে হইবে। শায়েখ আহমদকে কতলের বিষয়ে পরে

চিন্তা করা যাইবে। বাদশাহ নিজে সেনাপতি সাজিলেন। বিশাল সেনাবাহিনী সহকারে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সাম্রাজ্যব্যাপী বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া এই বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলিতেছিল। যে সকল আমীরগণকে বাদশাহ আসফ খানের চক্রান্তে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তার ভার দিয়া পাঠাইয়া দিলেন, তারা হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.)-এর কারাবরণের সংবাদ শুনিয়া অস্থির হইয়া গেলেন। প্রিয় মুর্শিদের প্রতি এই অত্যাচারের সংবাদে তাহাদের অন্তরে ক্ষোভের অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা পরস্পর চিঠিপত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে এই গুরুতর সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। শেষ পযর্ন্ত তারা সিদ্ধান্তে আসিলেন যে, বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে হইবে। কারণ, বাদশাহ ও তার দল হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-কে কয়েদ করিবার ষড়যন্ত্র পূর্বে করিয়াছিল এবং এই কাজ যাহাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তাই তাহাদেরকে রাজধানী হইতে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিদ্রোহ করা ছাড়া এখন আর কোন উপায় নাই, শাহী প্রাসাদে জঘন্য চক্রান্ত চলিতেছে। সেই চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করিয়া দিতে হইবে।

এই সিদ্ধান্তের পর যুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। বিভিন্ন স্থান হইতে সৈন্য আসিয়া কাবুলে সমবেত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে এই সমাবেশ বিশাল সেনাবাহিনীতে পরিণত হইল। এই সেনাবাহিনীর সেনাপতি হইলেন মহব্বত খান। মহব্বত খান খোৎবা হইতে বাদশাহর নাম বাদ দিবার নির্দেশ দিলেন এবং মুদ্রা হইতেও বাদশার নাম উঠাইয়া দিলেন। অতঃপর যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তারপর তিনি তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিশাল মুজাহিদীবাহিনী আগাইয়া চলিয়াছে। সবারই মুখে সত্যের দীপ্তি জ্বল-জ্বল করিতেছে। অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রাম। অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর যুদ্ধ। মোঘল বাদশাহর অহঙ্কার ধূলায় মিশাইয়া দিতে হইবে। প্রিয় মুর্শিদের প্রতি অত্যাচারের সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে। ঝীলাম নদীর তীর। উভয় বাহিনী সামনা-সামনি দাঁড়াইল। একদিকে শাহী বাহিনীর সেনাপতি স্বয়ং বাদশাহ। অপরদিকে বিদ্রোহী বাহিনীর সেনাপতি হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.)-এর সাচ্চা মুরিদ মহব্বত খান। যুদ্ধ শুরু হইল। শাহী বাহিনী বিদ্রোহী বাহিনীকে আক্রমণ করিল। বাদশাহ বীরবিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন মহব্বত খানের উপর। মহ্বব্বত খান প্রতি আক্রমণ না করিয়া কৌশলমূলক পলায়ন করিলেন। বাদশাহ তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। শাহী বাহিনীর মধ্যে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.)-এর অনেক ভক্ত ছিলেন। বাদশাহর তা জানা ছিল না। তিনি যখন নিজ বাহিনী থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন, তখন মহব্বত খান উভয় বাহিনীর মুজাদ্দিদভক্তদের সহায়তায় সহজেই বাদশাহকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং বন্দি করিলেন।

শাহী বাহিনী পরাজিত হইল। বাদশাহ বন্দি হইলেন। মহব্বত খানের সমস্ত সৈন্যদের মনে বিজয়ের আনন্দ। সবারই মনে আশা, এইবার দিল্লীর মসনদে তাহারা হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.)-কে উপবেশন করাইবেন। মহব্বত খানের অন্তরেও সেই আশা। তিনি হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর নির্দেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনদিন কাটিয়া গেল। অবশেষে হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর নির্দেশ আসিল, ফেৎনা ফ্যাসাদ বন্ধ করুন। বিশৃঙ্খলা আমার কাম্য নয়। পূর্বের মত বাদশাহর অনুগত হইয়া চলুন।

মহব্বত খানের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কোন বাধা নাই, বিপত্তি নাই। দিল্লীর মসনদ শূন্য। ইচ্ছা করিলেই উহাতে আরোহণ করা যায়। কিন্তু কী করা যাইবে প্রিয় মুর্শিদের হুকুম। মহব্বত খান তাঁর ইচ্ছাকেই শিরোধার্য করিয়া লইলেন। তিনি তো তাঁহার গোলাম ব্যতীত কিছু নহে। প্রেমাস্পদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য করাই প্রেমিকের কাজ।

তিনি তো মুজাদ্দিদ কুসুমের আশেক ছাড়া আর কিছুই নহে।
যে জন যাহার প্রেমে হয়েছে বিলীন
সে জন নিশ্চয় হইবে তাহার অধীন।
মহব্বত খান বাদশাহকে মুক্ত করে দিলেন এবং প্রিয় মুর্শিদের নির্দেশ তাকে জানাইয়া দিয়া, পূর্বের মত শাহী আনুগত্যের সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শুধু তাজিমি সেজদা করিলেন না। নতুন বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা লইয়া বাদশাহ জাহাঙ্গীর রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। পরাজিত হইয়াও তিনি জয়লাভ করিলেন। বন্দি হইয়াও সসম্মানে মুক্তি পাইলেন। এ কেমন বিস্ময়! সম্প্রতি বাদশাহ যেন কেমন হইয়া গিয়াছেন। যুদ্ধে তিনি কি সত্যিই জয়লাভ করিয়াছেন? ইহা কি জয় না পরাজয়? প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া তিনি যাঁহাকে বন্দি করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে এক দিনও বন্দি থাকিতে দিলেন না। কি-ই বা তাঁহার অপরাধ ছিল? আদব কি মানবতা অপেক্ষা বড়? প্রতিটি ঘটনায় যিনি প্রমাণ করিয়াছেন, দুনিয়ায় কোনপ্রকার শান-শওকতের বিন্দু পরিমাণ মোহ তাঁর নাই। সেই নির্লোভ নির্মোহ আল্লাহর ফকিরকে বন্দি করিবার কী অধিকার তাহার আছে? তিনি যাঁহাকে কষ্ট দিয়াছেন সেই আল্লাহর ফকির বরাবরই তাহার কল্যাণ কামনা করিয়াছেন। তিনি যাঁহাকে গৃহচ্যুত করিয়াছেন সেই আল্লাহর ফকির তাহার হৃত সিংহাসন নির্দ্বিধায় ফেরৎ দিয়াছেন। পরাজয়, তাহারই শোচনীয় পরাজয় হইয়াছে। বাদশাহর মোঘলীয় দাম্ভিকতা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। বিশাল হিন্দুস্তানের বাদশাহ হইয়াও হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর অন্তর কত বিশাল। প্রকৃতপক্ষে ফকিরগণই বাদশাহ। বাদশাহর অন্তরে অনুতাপের অনল দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শাহাজাদা শাহজাহান বহুদিন হইতে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.)-এর মুক্তির জন্য সুপারিশ করিতেছিলেন। বাদশাহও এবার ভাবিলেন, হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-কে মুক্তি দিতে হইবে। সত্য বুঝিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে, আর নয়। বাদশাহ হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-কে মুক্তির আদেশ প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে শাহী দরবারে তশরীফ আনিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) মুক্তি পাইলেন কিন্তু বাদশাহর সহিত সাক্ষাতের পূর্বে তিনি সাতটি শর্ত প্রদান করিলেন। তিনি জানাইলেন, শর্তগুলি মানিয়া লইলে তিনি বাদশাহর সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছেন।
শর্তসমূহ :
১. দরবার হইতে তাজিমি সেজদার প্রচলন উঠাইয়া দিতে হইবে।
২. ভগ্ন ও বিরান মসজিদসমূহ আবাদ করিতে হইবে।
৩. গরু জবেহ করিবার উপর যে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে, তাহা রহিত করিতে হইবে।
৪. ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য বিভিন্ন স্থানে কাজী, মুফতি নিয়োগ করিতে হইবে।
৫. জিজিয়া কর পুনরায় প্রবর্তন করিতে হইবে।
৬. সকলপ্রকার বেদাত কার্যকলাপ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।
৭. রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে হইবে।
বাদশাহ সমস্ত শর্ত নির্দ্বিধায় মানিয়া লইলেন। শর্তসমূহ বাস্তবায়িত করিবার জন্য শাহী ফরমান জারী করা হইল। তাজিমি সেজদা বন্ধ হইল। গরু জবেহ-এর উপর নিষেধাজ্ঞা আর রহিল না। জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তিত হইল। সকল প্রকার বেদাত কার্যকলাপ কঠোর হস্তে দমন করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল। শরিয়তভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, স্থানে স্থানে কাজী নিয়োগ করা হইল। শহর ও গ্রামে মসজিদ-মাদ্রাসা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল। বাদশাহ নিজের আম দরবারের সম্মুখে একটি মসজিদ

নির্মাণ করাইলেন।
হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.) বাদশাহর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজধানীতে আসিলেন। বাদশাহ মহা সমাদরের সহিত সসম্মানে তাঁহাকে দরবারে লইয়া গেলেন। বাদশাহ তাঁহার নিকট নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া মাফ চাহিলেন। অতঃপর হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর পবিত্র হস্তে বাইয়াত গ্রহণ করিলেন।

মুজাদ্দিদ কী এবং কেন

মুজাদ্দিদ উপাধি লাভ: ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদ আলফেসানী হযরত শায়খ আহমদ শেরহিন্দী (রহ.) স্বীয় মুর্শিদ হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (রহ.)-এর নিকট থেকে নকশবন্দিয়া তরিকার খাস নেসবত লাভ করার পর, তাঁর নির্দেশে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিপূর্বেই তাঁর সুখ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে চারদিক থেকে দলে দলে লোক তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে বাইয়াত হতে থাকে। এই সময় একদিন তিনি স্বীয় হুজরার মধ্যে ফজরের নামাজের পর মোরাকাবায় মশগুল আছেন। এমন সময় হযরত রাসুলেপাক (সঃ) রুহানীভাবে সমস্ত আম্বিয়া, অসংখ্য ফেরেশতা এবং আউলিয়া ও গাউস কুতুবদের সঙ্গে নিয়া সেখানে তাশরীফ আনেন এবং নিজ হাতে তাঁকে একটি অমূল্য খিলআত (অর্থাৎ, স্বীয় প্রতিনিধিত্বের প্রতীকস্বরূপ এক বিশেষ পোশাক) পরিয়ে দেন এবং বলেন, 'শায়খ আহমদ মুজাদ্দিদের প্রতীকস্বরূপ আমি তোমাকে এই 'খিলআত' পরিয়ে দিলাম এবং দ্বিতীয় সহস্রাব্দের জন্য তোমাকে আমার বিশেষ প্রতিনিধি মনোনীত করলাম। আমার উম্মতের দ্বীন-দুনিয়া তথা ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্ব আজ থেকে তোমার ওপর ন্যস্ত করা হল'। এই ঘটনাটি ১০১০ হিজরীর ১০ই রবিউল আউয়াল মাসে শুক্রবার ফজরের নামাজের সময় সংঘটিত হয়। আম্বিয়াগণ সাধারণত যে বয়সে পয়গম্বরী লাভ করতেন, সেই বয়সে অর্থাৎ চল্লিশ বছর বয়সেই হযরত শায়খ আহমদ শেরহিন্দী (রহ.) 'মুজাদ্দিদ' উপাধিতে ভূষিত হন। এই ঘটনার দ্বারা এ কথাই প্রমাণ হয় যে, নবীসুলভ দায়িত্বের বোঝা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁরই উপর সোপর্দ করেন।

মুজাদ্দিদ কাকে বলে: মুজাদ্দিদ আরবী শব্দ। এর অর্থ সংস্কারক। মানুষ যখন ধর্মবিমুখ হয়ে স্বেচ্ছাচারিতা ও শয়তানের পায়রবী শুরু করে, জাতীয় ও নৈতিক জীবন যখন হয় কলুষিত, তখন তাদের হেদায়েত করার প্রয়োজনে তথা গোমরাহীর অতল থেকে তাদেরকে টেনে তুলে, সত্য ও আদর্শের রাজপথে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে, আল্লাহতায়ালা বিশেষ দায়িত্ব সহকারে তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এটাই চিরন্তন রীতি। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পূর্ব পর্যন্ত যুগে যুগে নবী রাসুলদের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা সবাই পথহারা বিভ্রান্ত মানুষদেরকে সত্য পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। নবুয়তের ধারা যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন নবীচরিত্রের যাবতীয় গুণাবলীর অধিকার দিয়ে নায়েবে নবীদের উপর সেই মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়। সত্য-দ্বীনের অনুসারী হক্কানি আলেম-ওলামা কামেল-মোকাম্মেল পীর-মুর্শিদ দরবেশগণ সকলেই নবীর নায়েব রূপে মানব জাতিকে হেদায়েত করেন। কিন্তু 'মুজাদ্দিদ' পদটি অন্য সমস্ত উপাধি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ। কাউকে মুজাদ্দিদরূপে বরণ করার অর্থই হল, এলেম ও আখলাক উভয় ক্ষেত্রে তাঁরা অনন্য-সাধারণ মহত্ত্বকে স্বীকার করে নেওয়া। ধর্মের সংস্কারসাধন মূলত নবীদের কাজ এবং এই কাজ কেবল তাঁরাই করতে পারেন, যাঁরা আখলাকে নবী বা নবীচরিত্রের জীবন্ত প্রতীক এবং দ্বীনের সংস্কার বা ধর্মের প্রকৃত রূপায়নের কাজ সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার মত পরিপূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী। যে কোন ব্যক্তি নিজের চেষ্টা ও সাধনা বলে বড় আলেম বা কামেল হতে পারেন এবং দলীয় লোকদের সমর্থন-পুষ্ট হয়ে কোন বড় পদের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু নবুয়ত যেমন স্বীয় চেষ্টা ও সাধনা বা দলীয় সমর্থন দ্বারা লাভ করা সম্ভব হয়নি, অনুরূপভাবে 'মুজাদ্দিদ' উপাধিও লাভ করা সম্ভব নয়। নবুয়ত যেমন আল্লাহতায়ালার একটি বিশেষ দায়িত্ব প্রদান, তেমনই 'মুজাদ্দিদ' উপাধি প্রদানও তাঁর আর একটি বিশেষ নিয়ামত। আল্লাহতায়ালা যাকে ইচ্ছা

করেন, তিনিই কেবল এই মহান পদের অধিকারী হতে পারেন। কারও পক্ষে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই পদে উন্নীত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। কাজেই সাধারণ হাদী বা পথপ্রদর্শক আর 'মুজাদ্দিদ' এক কথা নয়। বরং উভয় পদবীর মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান নিহিত। আল্লাহরাব্বুল আলামীন আম্বিয়া আলাইহিমুস-সালামের আবির্ভাব সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে 'বেসাত' শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যার অর্থ 'প্রেরণ'। যেমন আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন– 'হু-আল্লাজি বা'য়াছা ফিল উম্মিইনা রাসূলাম মিনহুম'।
অর্থ:তিনি সেই মহান স্রষ্টা, যিনি নিরক্ষর লোকদের নিকট তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসুলকে প্রেরণ করেছেন।
'ওয়া-মাকুন্না মুয়াজ্জিবিনা হাত্তা ইয়াব আছা রাসুলা'।
অর্থ:আমি কখনও আযাব দিই না, যতক্ষণ না আমি তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করি।
'বা-আছনা ইলাইহিম রাসুলা।'
অর্থ: আমি তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করেছিলাম'।
এখানে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলামের পরিভাষা অনুযায়ী 'বেসাত' শব্দটি দেখলেই বোঝা যায়, এখানে কোন নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে। অতএব, এই শব্দটি নবুয়তের জন্য খাস বা নির্দিষ্ট। হাদিস শরীফে 'মুজাদ্দিদ' উপাধির ক্ষেত্রেও 'বেসাত' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন, হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– 'ইন্নাল্লাহা ইয়াব-য়া'ছু লিহা-জিহিল উম্মাতি আলা-রা'ছি কুল্লি মিয়াতি ছানাতিম মিন মাই-ইউজাদ্দিদু-লাহা আমরি দিনিহা'
অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা এই উম্মতের হেদায়েতের জন্য প্রতি শতাব্দীতে এমন এক মহাপুরুষকে প্রেরণ করেন, যিনি তাঁর যুগে দ্বীনের সংস্কারক হবেন।
'বেসাত' শব্দটি নবুয়তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অথচ উপরোক্ত হাদিসে মুজাদ্দিদ সম্পর্কেও এই একই পরিভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। অতএব, একথা সুস্পষ্ট যে, নবুয়ত ও মুজাদ্দিদিয়াত এই উভয় পদের মনোনয়ন একমাত্র আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তফাৎ এতোটুকুই যে, নবুয়ত হলো আসল বা মূল বৃক্ষ আর মুজাদ্দিদিয়াত হলো এর প্রতিবিম্ব বা ছায়া। নবীর প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত, কোরআনের ভাষায় যাকে ওহী বলা হয়েছে, তা চূড়ান্ত ও ধ্রুব সত্য, আর মুজাদ্দিদের ইলহাম ও তার নিকটবর্তী সত্য এবং নবীর ইলহামের পরিপন্থী না হলে তা-ও ধ্রুব সত্য। 'মুজাদ্দিদ' উপাধিটি যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা হযরত শায়খ আহমদ শেরহিন্দী (রহ.)-এর নিজের একটি উক্তি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি বলেছেন, আমার ওপর মুজাদ্দিদিয়াত বা সংস্কারকের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। শুধু পীর-মুরিদি করার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়নি। মুরিদগণকে মারেফতের তালিম বা শিক্ষা দেওয়া আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। যে মহান দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়েছে, তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা এবং আমার কর্মক্ষেত্রও সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। আমার ওপর অর্পিত কার্যের তুলনায় মুরিদানকে তরিকতের তালিম দেওয়া এবং সাধারণ মানুষকে কামালিয়াতের দরজায় পৌঁছানো, রাস্তা থেকে কুড়ানো তুচ্ছ জিনিসের মতোই।

৩৫ বছরের সাধনায় রিয়াজত ধ্যান-মোরাকাবা মোশাহাদায় পেলাম নামাজ ও জিকির সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত বা এবাদতে আকবর

আমি ৩৫ বছর কঠোর রিয়াজত, সাধনা, কাশ্‌ফুল কবুর, অর্থাৎ ৩ বছর কবর মোরাকাবা করিয়া, ১১ বছর আপন পীরের কাছে বাইয়াত (শিষ্যত্ব) গ্রহণ করিয়া তাঁর পায়রুবী এবং খেদমত করিয়া সকল মোকাম সায়ের করিয়া জানতে পারলাম নামাজ ও জিকির সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। ইবাদতে আকবর।

'ইন্নাছ ছালা-তা তানহা আনিল ফাহশা-ই ওয়াল মুনকারি; ওয়ালাযিকরুল্লা-হি আকবার'।

অর্থ: নামাজ প্রতিষ্ঠা কর, (কারণ) নামাজ অশ্লীল ও মন্দ গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর জিকির-ই সর্বশ্রেষ্ঠ (সূরা আনকাবুত, আয়াত-৪৫)।

'ফাইযা কাদ্বাইতুমুছ ছালাতা ফাযকুরুল্লা-হা ক্বিয়া-মাও ওয়া কুউ দাও, ওয়া আলা জুনুবিকুম, ফাইযাত্ব মা'নানতুম ফা আক্বীমূছ ছালাতা, ইন্নাছ ছালা-তা কা-নাত, আলাল মু'মিমীনা কিতা-বাম মাওকুতা' (সূরা-নিসা, আয়াত-১০৩)।

অর্থ: অতঃপর তোমরা নামাজ শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে সর্ব অবস্থায় আল্লাহর জিকির করবে। যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন যথাযথভাবে নামাজ পড়বে। নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে নামাজ পড়া বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্যই কর্তব্য।

'আলা-বি-যিকরিল্লা-হি, তাত্তামাইননুল কুলুব্'।

অর্থ: সাবধান! আল্লাহর জিকির দ্বারা অন্তরে শান্তি আসে' (সূরা রাদ, আয়াত- ২৮)।

'ইয়া-আইয়্যুহাল লাযীনা আ-মানু লা-তুলহিকুম আমওয়া-লুকুম ওয়ালা আওলা-দুকুম, আন যিকরিল্লা-হি ওয়া মাই ইয়াফ'আল য্যা লিকা ফাউলা ইকা হুমুল খা-সিরুন' (সূরা মুনাফিকুন, আয়াত-৯)।

অর্থ: হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ধনসম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি আল্লাহর জিকির থেকে যেন গাফিল না থাকে, আর যারা এভাবে জিকির থেকে গাফিল হবে, তারাই হবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত।

হযরত আনাছ (রাঃ) হইতে অন্য এক হাদিসে রেওয়ায়েত আছে– 'ইন্নাল মু'মিনুনা ইযা কানা ফিস্‌ছালাতি ফাইন্নামা ইউনাজি রাব্বাহু'।

অর্থ: নিশ্চয় মুমিন ব্যক্তি নামাজের মধ্যে তাহার পালনকর্তার সহিত কথা বলিয়া থাকেন'।

রাসুল (সঃ) ফরমান– 'আন তা'বুদাল্লাহা কা-আন্নাকা তারা-হু ফা-ইল্লাম তাকুন তারা-হু ফা-ইন্নাহু ইয়ারাক (হাদিসে কুদসী)।

অর্থ: তুমি এমনভাবে আল্লাহতায়ালার বন্দেগী কর, যেন তুমি আল্লাহকে দেখিতেছ, যদি উহা না পার, তবে এইরূপভাবে আল্লাহর এবাদত কর, যেন আল্লাহ তোমাকে দেখিতেছেন'।

এই হাদিস দ্বারা এ সত্যই প্রমাণিত হইতেছে যে, সমস্ত নামাজই আল্লাহর মোশাহাদা, দর্শন বা দিদার।

ইল্লাল্লার রেৎ দ্বারা মন কর পাক,
মহব্বতের ত্যাগ দ্বারা ছিনা কর দুই ভাগ।

আল্লাহতায়ালার আজাব হইতে মুক্তি পাওয়ার সর্বোত্তম বস্তু আল্লাহর জিকির ব্যতীত

অন্য কিছুই নাই। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) দুইবার উক্তরূপ বলিয়াছেন। উপস্থিত সকলে বলিলেন– হুজুর, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা কি জিকিরের সমকক্ষ হইবে না? রাসুল (সঃ) বলিলেন– না, যদি ধর্মযোদ্ধা যুদ্ধ করিতে করিতে তাহার তরবারি খণ্ডবিখণ্ডও করিয়া ফেলে।

হাদিস: তিবরানী ও বায়হাকী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, হযরত নবী করিম (সঃ) বলিয়াছেন– যে ব্যক্তি চারটি বস্তু আল্লাহর দরবার হইতে পাইয়াছেন, তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এই চারটি বস্তু হইতেছে :

১. যে দিল আল্লাহর শোকর করে।
২. যে জিহ্বা আল্লাহর জিকির করে।
৩. যে শরীর মছিবতে ছবর করে।
৪. যে স্ত্রী স্বামীর সম্মান ও মালের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

হযরত আবু মুসা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে, রাসুলে করিম (সঃ) ফরমাইয়াছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে, সে ব্যক্তি জীবিত লোকের তুল্য, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে না, সে মৃত লোকের তুল্য। অন্য আর এক হাদিসে আছে, রাসুলপাক (সঃ) ফরমাইয়াছেন– 'আছ সালাতুল মিরাজুল মু'মিনীন'।

অর্থ: নামাজ মুমিনদের জন্য মিরাজ, অর্থাৎ খোদাপ্রাপ্তির সিঁড়ি।

আমি এখন তরিকতের বিদ্বেষী শুধু শরিয়ত অবলম্বী আলেম ও মুসল্লিগণকে জিজ্ঞাসা করি, নামাজে আপনাদের মিরাজ কার কতদিন হয়েছে? এতকাল নামাজ পড়িয়া যদি কোনদিন মিরাজ না হইয়া থাকে, তবে রাসুল (সঃ) কি মিথ্যা বলিয়াছেন? (নাউযুবিল্লাহ), তিনি সত্যই বলিয়াছেন। কেবল আমরা আমাদের নিজ শৈথিল্যে নামাজকে মিরাজ করিয়া তুলিতে পারি না। কারণ আমরা চেষ্টা করি না। অথচ ইহা করা অসম্ভব নহে, কামেল-মোকাম্মেল মুর্শিদের তাওয়াজ্জুহ গ্রহণ করিয়া কঠোর সাধনা ও চেষ্টা করিলেই তা অর্জন সম্ভব হইবে।

হে সম্মানিত পাঠকগণ! উপরোল্লেখিত কোরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস ও মোতাব্বরসহ বড় বড় কিতাবাদি পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণ করিয়া জানা গেল, নামাজে মিরাজ বা দিদার (আল্লাহতায়ালার দর্শনলাভ) করিতে হইলে, একজন কামেল 'মুর্শিদ' অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। মুর্শিদ আরবি শব্দ, বাংলাতে বলা হয় পথপ্রর্দশক আর ফারসীতে বলা হয় পীর। কেননা কামেল মুর্শিদ তাঁর ভক্ত-মুরিদানদের আত্মশুদ্ধি, দিলজিন্দা ও নামাজে হুজুরীসহ ধ্যান-মোরাকাবা শিক্ষা দিয়ে স্রষ্টার ধ্যানে নিমগ্ন করেন। ফলে সে নামাজের মধ্যে মিরাজ লাভ করিতে সক্ষম হয়।

আশেকান ও জাকেরানদের প্রতি আমার নসিহত অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে অজিফা আমল করিতে হইবে

প্রথমে পবিত্র কালাম ফাতেহা শরীফ পাঠ ফজর নামাজের পর, আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ্সহ তওবা ইস্তেগফার ৭ বার পাঠ করিবেন। উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি জামবিউ ওয়া'তুবু ইলাইহি'।

এরপর বিসমিল্লাহর সহিত সূরা ফাতেহা তিন (৩) বার পাঠ করিবেন। উচ্চারণ: আলহাম্দু লিল্লা-হি রাব্বিল আলামিন। আর রাহ্মানির রাহীম। মা-লিকি ইয়াওঁমিদ দীন। ইয়্যা কা না'বুদু ওয়া ইয়্যা কা নাস্তাঈন। ইহ্ দিনাছ ছিরাত্বল মুস্তাকিম। ছিরাত্বল লাযীনা আনআমতা আলাইহিম। গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ দ্বয়াল্লিন। আমিন।

এরপর বিসমিল্লাহর সহিত সূরা ইখলাছ দশ (১০) বার পাঠ করিবেন। উচ্চারণ : কুলহু ওয়াল্লা-হু আহাদ। আল্লা হুস্ ছামাদ্। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউ লাদ্। ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। এরপর দরূদ শরীফ ১১বার পাঠ করিবেন। উচ্চারণ: আল্লাহুমা ছাল্লি-আলা সায়্যিদিনা মোহাম্মাদীউঁ উছিলাতি ইলাইকা ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লিম।

খতম শরীফের গুরুত্ব : বর্তমান সময় অত্যাধুনিক যুগ, স্যাটেলাইটের যুগ, মিডিয়ার যুগ, ইন্টারনেট, ফেইসবুকের যুগ, কম্পিউটারের যুগ। এই সময়ে ঈমান ও আখলাক ঠিক রাখা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। যদি আপনারা বেদাতী কাজ ও বিষাক্ত সাপের ছোবল হইতে ঈমান বাঁচাইতে চান, তাহলে আমার দেওয়া অজিফা খতম শরীফের আমল মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিয়া আদায় করুন। আল্লাহতায়ালা আপনাদের ঈমান রক্ষা করিবেন। খতম শরীফ আমলের মাধ্যমে পরিত্রাণ পাবেন।

খতম শরীফ পড়ার নিয়ম : প্রথমে দরূদ শরীফ ১০০ বার পাঠ করিবেন। উচ্চারণ: আল্লাহুমা ছাল্লি-আলা সায়্যিদিনা মোহাম্মাদীউঁ উছিলাতি ইলাইকা ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লিম। এরপর পাঠ করিবেন 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্' পাঁচশত (৫০০) বার। এরপর পুনরায় দরূদ শরীফ একশত (১০০) বার পাঠ করিবেন। উচ্চারণ: আল্লাহুমা ছাল্লি-আলা সায়্যিদিনা মোহাম্মাদিউঁ উছিলাতি ইলাইকা ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লিম।

খতম শরীফের পর মোজাদ্দেদ সাহেবের শানে গাইবেন।

উচ্চারণ :

মোজাদ্দেদ আলফেসানী মান,
মোজাদ্দেদ আলফেসানী মান।
দেলো জানাম বাসও কেতু,
বহরদম যারে মিনালেদ
নামা আতাল আতে জিবা
মোজাদ্দেদ আলফেসানী মান ॥
গোলামে তু শুদাম আজ্জান
মুরিদেতু শুদাম আজদেল
শুয়াদ বর পায়েতু কুরবা
মোজাদ্দেদ আলফেসানী মান।

বমিছকিনাম ধরে গা- হাদ'
চু ফরমায়ে নযর বারে,
বহা লম হাম, নযর ফরমা,
কে খাকে পা য়ে মিছ কিনাম
মোজাদ্দেদ আলফেসানী মান ॥

জোহর নামাজ : ফরজ ও সুন্নাত নামাজের পর নিম্নলিখিত নিয়মে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িবেন।

প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাছ পাঠ করিবেন। যাহাদের সূরা কাফিরুন জানা নাই বা মনে নাই, তারা উভয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর, সূরা ইখলাছ দিয়া নামাজ আদায় করিবেন।

আছর নামাজ : আছর নামাজের পরে 'তসবীহ্ ফাতেমী' আমল করিবেন। অর্থাৎ, সুবাহানাল্লাহ তেত্রিশ (৩৩) বার, আলহাম্দুলিল্লাহ তেত্রিশ (৩৩) বার এবং আল্লাহু আকবার চৌত্রিশ (৩৪) বার পাঠ করিবেন।

মাগরিব নামাজ : ফরজ ও সুন্নাত নামাজের পর দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করিবেন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা এখলাস পাঠ করিবেন। যাহাদের সূরা কাফিরুন জানা নাই বা মনে নাই, তারা উভয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাছ দিয়া নামাজ আদায় করে পাক-কালাম 'ফাতেহা শরীফ' পাঠ করিবেন। এরপর ছওয়াব রেছানী করিবেন।

এশার নামাজ : ফরজ ও সুন্নাত নামাজের পর দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করিবেন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর, সূরা ইখলাছ পাঠ করিবেন। যাহাদের সূরা কাফিরুন জানা নাই বা মনে নাই, তারা উভয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাছ দিয়া নামাজ আদায় করিবেন এবং মোনাজাত করিবেন। বেতের নামাজের পর পাঁচশত (৫০০) বার দরূদ শরীফ, উচ্চারণ: আল্লাহুমা ছাল্লি-আলা সায়্যিদিনা মোহাম্মাদিউঁ উছিলাতি ইলাইকা ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লিম। পড়িয়া নবীজিকে নজরানা দিয়া বিছানায় পিঠ দিবেন।

রহমতের ডাক : রাতের শেষ ভাগে (তৃতীয় প্রহর) উঠিয়া পবিত্র বিছানায় বসিয়া রহমতের ডাক দিবেন– ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহ্মানু, ইয়া রাহীম। এই তিন নাম ধরিয়া মহান রাব্বুল আলামিনকে ডাকিবেন এবং চোখের পানি ছাড়িয়া গুনাহ্ মাফের জন্য কান্নাকাটি করিবেন। মাঝে মাঝে ইয়া রাহ্মাতাল্লিল আলামিন বলিয়া দয়াল নবীজিকে ডাকিবেন। এরপর কিছুক্ষণ আল্লাহর ইসমে জাত আল্লাহ-আল্লাহ-আল্লাহ জিকির করিবেন।

মহানবী (সঃ) বলেন, আমি আদম (আঃ) কে সৃষ্টির পাঁচশ চার কোটি বছর আগে আল্লাহতায়ালার কাছে নূরে মোহাম্মদী রূপে বিদ্যমান ছিলাম

'কুনতু নূরান বাইনা ইয়াদাই রাব্বি ক্বাবলা খালকি আদামা বি-আরবাতি আশারা আলফা' (রাওয়াহুল মুসলিম)। 'আমি আদম (আঃ)কে সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহতায়ালার কাছে নূরে মোহাম্মদী রূপে বিদ্যমান ছিলাম। ঐ জগতের একদিন পৃথিবীর এক হাজার বছরের সমান। অর্থাৎ, পাঁচ'শ চার কোটি বছর' (হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিস: আল বেদায়া ওয়া নেহায়া ও আনওয়ারে মোহাম্মদী)। নবী করীম (সঃ) জিব্রাঈল (আঃ)-কে তাঁর বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বলেন যে, চতুর্থ আকাশে একটি উজ্জ্বল তারকারাজি সত্তর হাজার বছর উদিত অবস্থায় এবং সত্তর হাজার বছর অস্তমিত বা নিভন্ত অবস্থায় বিরাজমান থাকত। আমি ঐ তারকারাজিটিকে বাহাত্তর হাজার বার উদয় হতে দেখেছি। নবী করিম (সঃ) বলেছেন, জিব্রাঈল! আল্লাহতায়ালার শপথ, আমিই ছিলাম ঐ তারকা' (মুসলিম শরীফ)। কুনতু নবীয়্যাওঁ আদামু বায়ন্যাল মা ওয়াত্বীন' (রাওয়াহুল মুসলিম)।

অর্থ: নবীজি (সঃ) বলেন, আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম (আঃ) পানি এবং মাটির মধ্যে মিশ্রিত ছিল' (হাদিসে কুদ্‌সী, মুসলিম শরীফ)।

'কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লা হা ফাত্তাবিউ-নী ইউহ্‌বিবকুমুল্‌লা-হু ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লা-হু গাফুরুর রাহীম'।

অর্থ: প্রিয় হাবীব (সঃ) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহতায়ালাকে পাইতে চাও, তাহলে আমি রাসুল (সঃ)-কে ভালোবাসো, আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং ক্ষমা করবেন তোমাদের গুনাহ্, আল্লাহ ক্ষমাকারী অতি দয়ালু' (সূরা আলে ইমরান, পারা-৩, আয়াত-৩১)।

'কুল বিফাদ্বলিল্লাহি ওয়া বিরাহমাতিহি ফাবিযালিকা ফাল ইয়াফরাহু হুওয়া খাইরুম মিম্মা ইয়াজ্বমাউন'। অর্থ: হে রাসুল (সঃ), আপনি মানবমণ্ডলীকে বলে দিন, আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও করুণাপ্রাপ্ত হয়ে তারা যেন ঈদ উৎসব পালন করে, এই ঈদ তাদের জন্য সব কিছু থেকে উত্তম'।

(সূরা ইউনুছ, পারা- ১১, আয়াত- ৫৮)।

নিশ্চয়ই মহানবী (সঃ) মানুষের জন্য মহা নিয়ামত, রহমত, কল্যাণ ইত্যাদি। আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে হুজুর (সঃ)-এর চেয়ে বড় নিয়ামত ও রহমত আর কী হতে পারে? আল্লাহতায়ালা উপরোক্ত আয়াতে হুজুর (সঃ)-এর জন্ম বা শুভ আগমনকে ঈদ উৎসব পালনেরই আদেশ দিয়াছেন। অতএব, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) পালন করা মানুষের জন্য ওয়াজিব।

'ওমাকা-না লিমুমিনিও ওয়ালা মুমিনাতিন ইযা-ক্বাদ্বাল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আমরান আইঁ ইয়াকুনা লাহুমুল খিয়ারতু মিন আমরিহিম ওয়ামাই ইয়া স্বিল্লা-হা ওয়া রাসূলুহু ফাক্বাদ দ্বল্লা-দ্বলা-লামমুবীনা'। অর্থ: আল্লাহ

ও রাসুল (সঃ)-এর আদেশ অমান্যকারীরা প্রকাশ্যভাবে পথভ্রষ্ট হবে বা গোমরা হবে' (সূরা আহ্‌যাব, পারা-২১-২২, আয়াত- ৩৬)।

নবী করিম (সঃ)-কে নিজেদের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে না পারলে, তোমরা প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না' (হাদিসে মাদারেজুন নবুয়্যত)।

‘ওয়া-লাক্বাদ কাতাবনা ফিযযাবুরি মিম বা’দিয যিক্‌রি আন্নাল আরদ্বা ইয়ারিছুহা ইবা-দিয়াস্ব-স্ব-লীহুন’ (সূরা আম্বিয়া, পারা- ১৭, আয়াত-১০৫)। অর্থঃ প্রিয় হাবীব (সঃ) নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ আপনার মহব্বতে আমার মাহাবুব বান্দাদেরকে পৃথিবীর স্বত্বাধিকারী করে তা আমার লওহে মাহফুজে লিখে রেখেছি।
‘কূল্ আসআলুকুম আলাইহি আজ্বরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কূরবা’।
অর্থঃ হে আমার নবী (সঃ) আপনি বলে দিন, রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কিছুই চাই না, তোমরা শুধু আমার আহালে বাইয়াতকে ভালোবাস’। (সূরা শূরা, পারা-২৫, আয়াত-২২)। নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আমার আহলে বাইয়াতের উদাহরণ হযরত নূহ (আঃ)-এর কিস্তির মত, যারা তাঁর কিস্তিতে উঠেছিল তাঁরাই নাজাত পেয়েছিল’। (তিরমিযি ও মুসলিম শরীফ)। সেই আহলে বাইয়াতের অন্তর্ভুক্ত চার সাহাবীসহ অন্যান্য সাহাবী ও আসহাবে সুফ্‌ফা আর সেখান থেকেই সূফীবাদ এসেছে।

কোরআন মজিদে উছিলা বা মধ্যস্থতা ধরার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) বেহেশত থেকে বের হওয়ার পর, চল্লিশ (৪০) বছর যাবত কিছুই পানাহার করেননি, আর লজ্জার কারণে তিনশ (৩০০) বছর যাবত উপরের দিকে মাথা তোলেননি। এই সুদীর্ঘ সময় তাঁরা আল্লাহর শাহী দরবারে ক্রন্দনরত ছিলেন, (খোলাসাতুত তাফসীর)। হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) তাঁর নিকট সামান্য ভুলের জন্য কত কান্নাকাটি করেছিলেন তার একটি বিবরণ পেশ করিয়াছেন ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাফসীরে কবীর'-এ। এক পর্যায়ে তিনি একখানি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং এতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করিম (সঃ) এরশাদ করেছেন– 'যদি সারা দুনিয়ার মানুষের কান্নাকাটি একত্রিত করা হয়, তবুও হযরত দাউদ (আঃ)-এর কান্নাকাটিই অধিকতর হইবে। আর যদি সারাদুনিয়ার মানুষের ক্রন্দন এবং হযরত দাউদ (আঃ)-এর ক্রন্দনকে একত্রিত করে হযরত নূহ (আঃ)-এর ক্রন্দনের পাশাপাশি রাখা হয়, তাহলে হযরত নূহ (আঃ)-এর ক্রন্দনই অধিকতর প্রমাণিত হবে। আর যদি সারা দুনিয়ার মানুষের ক্রন্দন এবং হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত নূহ (আঃ)-এর ক্রন্দনকে একত্রিত করা হয়, আর যদি হযরত আদম (আঃ) তাঁর একটি ভুলের জন্য যে ক্রন্দন করেছিলেন তা সামনে রাখা হয়, তাহলে হযরত আদম (আঃ)-এর ক্রন্দন অধিকতর বলে প্রমাণিত হবে' (তাফসীরে কবীর- ১ম খণ্ড)। হযরত আদম (আঃ)-এর কান্নাকাটির কারণে, তাঁর প্রতি আল্লাহতায়ালার দয়া হল। তিনি তাঁকে তওবার পন্থা শিখিয়ে দিলেন আর যে ভাষায় তওবা করতে হবে তাও শিখিয়ে দিলেন। হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে যে, হযরত আদম (আঃ)-কে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসুলে করিম (সঃ)-এর উছিলায় আল্লাহতায়ালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয়েছে। তখন আল্লাহতায়ালা তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আদম! মোহাম্মদ (সঃ)-কে তুমি কীভাবে জানলে? তদুত্তরে হযরত আদম (আঃ) আরজ করলেন, হে প্রভু! আমার সৃষ্টির পর আমি যখন আরশের দিকে তাকালাম তখন তাতে দেখতে পেলাম লেখা রয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'। তখনই আমি উপলব্ধি করিয়াছি যে, আপনার মহান দরবারে সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী হলেন হযরত মোহাম্মদ (সঃ)। এ জন্যই তাঁর উছিলায়ই ক্ষমা প্রার্থনা করেছি। তখন আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন, হে আদম! তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তিনি তোমাদেরই সন্তান। তাঁকে সৃষ্টি না করলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না' (খোলাসাতুত তাফসীর)।

অতঃপর আল্লাহতায়ালা হযরত আদম (আঃ)-কে শিক্ষা দিলেন, কোন কথা বললে তওবা কবুল হবে, কোন দোয়া পাঠ করলে তাঁর আরজি মঞ্জুর হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, সেই দোয়াটি হল– 'রাব্বানা জ্বালাম্না আন্ ফুছানা ওয়া ইল্লাম তাগ্ফিরলানা ওয়াতার হাম্না লানা কূনান্না মিনাল খাছিরিন'।

অর্থ: হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নিজেদের ওপর জুলুম করিয়াছি, যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন আর আমাদের ওপর দয়া না করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাব। এই কথাগুলো দ্বারা হযরত আদম (আঃ) মোনাজাত করিলেন, তখন আল্লাহতায়ালা হযরত আদম (আঃ)-এর তওবা কবুল করলেন। সূরা আ'রাফের এক আয়াতের ঘোষণা অনুযায়ী হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) উভয়ই এই দোয়া করিয়াছিলেন। মোটকথা রাসুল (সঃ)-কে উছিলা ধরার কারণে

আল্লাহতায়ালা তাঁদের গুনাহ্ মাফ করলেন এবং তওবা কবুল করলেন।
হে পাঠকগণ! কোরআন ও হাদিস পর্যালোচনা করে দেখা গেল, আল্লাহতায়ালার গোপন ভেদ ও রহস্য লুকাইয়া আছে। যদি আদম (আঃ) ভুল না করতেন আমরা সৃষ্টি হতাম কীভাবে? এখন এই হাকিকত ভেদ বুঝতে হলে চৈতন্য গুরু বা কামেল মুর্শিদের সান্নিধ্যে গেলে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির রহস্য জানা যাবে।
'ওয়া লাও আন্নাহুম ইয্ব য়ালামু আন্ ফুসাহুম্ জ্বাউকা ফাস্তাগফারুল্লাহা ওয়া-সতাগফারা ওলাহুমুর রাসুলু লাওয়াজ্বাদু-ল্লাহা তাওয়্যা বার্ রাহিমা' (সূরা নিসা, আয়াত-৬৪)।
অর্থ: যদি এ সকল লোক নিজেদের আত্মাসমূহের ওপর অত্যাচার করে, হে নবী (সঃ) আপনার দরবারে হাজির হয়ে যায় এবং আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবায়ে নাছুহা করে এবং আপনিও (ইয়া রাসুলুল্লাহ সঃ) তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে এরা আমি আল্লাহকে তওবা কবুলকারী, ক্ষমাকারী মেহেরবান হিসেবে পাবে। এ আয়াতে কারিমা দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল হুজুর (সঃ) প্রত্যেক গুনাহ্গারের জন্য সর্বসময় (কিয়ামতাবধি) মাগফিরাতের (ক্ষমা) উছিলা।
'ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আ-মানু আত্বীউল্লা-হা ওয়া আত্বীউর রাসুলা, ওয়া উলিল আম্রী মিন্কুম, ফাইন্ ত্বানাযাতুম-ফী শাইয়িন্ ফারুদ্দুহু ইলাল্লা-হি ওয়ার রাসুলী ইন্ কুন-তুম তুমিনূনা বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমি-ইল আখির, যা-লিকা খায়রুওঁ ওয়া আহসানু তাবিলা' (সূরা নিসা, পারা- ৪ আয়াত- ৫৯)।
অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, রাসুল (সঃ) ও আউলিয়াগণের আনুগত্য কর। কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে তা আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-এর ওপর ন্যস্ত কর। যদি আল্লাহ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখ, এ ব্যবস্থা তোমাদের জন্য উত্তম।
'আলা ইন্না আওলিয়া আল্লাহি-লা খাওফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্যানুন'। আল্লাযীনা আ-মানু ওয়াকানু ইয়াত্তা কুন। লাহুমুল বুশ্রা ফিল হা-ইয়া-তিদ দুনইয়া ওয়া ফিল আখিরাহ, লা-তাবদীলা লিকালিমা তিল্লাহু, যা-লিকা হুওয়াল ফাউযুল আযীম।
অর্থ: জেনে রাখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তাঁরা কোন বিষয়ে দুঃখিত হবেন না। যারা বিশ্বাস করে এবং সাবধানতা অবলম্বন করে, তাদের জন্য পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে সু-সংবাদ আছে। আল্লাহতায়ালার বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, এটিই মহা সাফল্য। (সূরা ইউনুছ, আয়াত- ৬২-৬৫)
'ইনাল্লাহা ক্বালা মান আদালি ওয়ালিইয়ান আযানতুহু বিল হারবী, ওয়ামা তাক্বাররবা ইলাইয়া আবদি বিশাই-ইন আহাব্বু ইলাইয়া মিম্মা ইকতারাসতু আলাইহি, ওয়ামা ইয়াযানু আবদি সামআহ আল্লাজি ইয়াসমাউ বিহী ওয়া বাসারাহু লাল্লাযি ইয়ুবসিরু বিহী ওয়াইয়াদাহু লাল্লাতি ইয়াবতিশু বিহা ওয়ারিজলাহু লাল্লাতি ইয়ামশি বিহা আলফা' (হাদিসে কুদ্সী, রাওয়াহুল বোখারী ও মিশকাত শরীফ)।
অর্থ: আমার বান্দা ফরজ আদায়ের মধ্য দিয়া আমার নৈকট্যলাভ করে, ফরজ আদায়ের পর নফল ইবাদতের মাধ্যমে তারা আমার ভালোবাসা লাভ করে, আমি যখন কাউকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। যখন সে আমার কাছে কিছু চায় আমি তাকে তা দিই' (হাদিসে কুদ্সী, বোখারী ও মিশকাত শরীফ)।
'ওয়ালা-তাকুলু লিমাই ইয়ুক্বতালূ ফী-সাবীলিল্লা-হি আমওয়াত; বাল্ আহ্ইয়া উওঁয়ালা কিল্ লা-তাশউরুন'।

অর্থ: যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে, তাদেরকে মৃত মনে কর না বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বোঝ না, (সূরা বাকারাহ্, পারা- ২, আয়াত-১৫৪)।
'ওয়াল তাহ্সাবান্নাল্লাযীনা কুতিলু ফী-সাবিলিল্লা-হি আমওয়াতা, বাল আহইয়া-উন ইন্দা রাব্বিহিম ইউরযাকু-ন'।
অর্থ: যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে, তাদেরকে মৃত মনে কর না, বরং তারা জীবিত, স্বীয় রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত, স্বীয় রবের পক্ষ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত' (সূরা আলে ইমরান, পারা-৩, আয়াত-১৬৯)।
'ক্বালা উমর বিন খাত্তাব রাদিআল্লাহুতায়ালা আনহু আন্নাহু ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদ-দু-আউ মাউকুফুন বাইনাসামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব ইল্লা বিসসালাহ'।
অর্থ: হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিস, নবী করীম (সঃ) বলেছেন যে, দরূদ শরীফ পাঠ করা না হলে উম্মতের দোয়াসমূহ আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। যখন দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়, তখন তা আল্লাহতায়ালার দরবারে পেশ করা হয় এবং তা কবুল হয়' (মিশকাত শরীফ)।
'মান আদালি ওয়ালি ইয়ান ফাকাদ আযান তাহু বিলহারবী' (রওয়াহুল মুসলিম)।
অর্থ: যে ব্যক্তি আমার কোন আউলিয়ার সাথে শত্রুতা বা দুশমনি করে, আমি তাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাই।
'আন আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বালা ইন্নি সামিইতু রাসুলাল্লাহি (সঃ) ইয়াকুলু আল আবদালু ইয়াকুনুনা বিশহাশামী ওয়াহুম আরবাউনা রজুলানা কুল্লামা মাতা রজুলুন আবদাল্লাতু মা কানাহু রুজালান ইউহক্বা বিহিমুল গাইনু ওয়াইনতাসারু বিহিম আলাল আদা-ই-ওয়া ইউতনরাফু আন আহলিমশামী বিহীমুল আজিব্বু' (রওয়াহুল মিশকাত)।
হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নবী করিম (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, সিরিয়ায় চল্লিশজন আবদাল আছেন, তাদের উছিলায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়, শত্রুরা তাদের উছিলায় পরাজিত হয় এবং তাদের উছিলায় সিরিয়াবাসীদের ওপর থেকে আজাব দূরীভূত হয়' (মিশকাত শরীফ)।
হে সম্মানিত পাঠকগণ! আল্লাহতায়ালার সৃষ্টির শুরু থেকেই উছিলার মাধ্যমে সকল কিছু সম্পন্ন করে আসছেন। অথচ আল্লাহতায়ালার কথা অমান্য করে কিছু সংখ্যক মানুষ কোরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে বর্তমান সমাজে অশান্তি করছেন। তাই এদেরকে মহান আল্লাহতায়ালা হেদায়েত দান করুন, আমিন।

আমার জাকের-মুরিদদের প্রতি নীতি-আদর্শ ও নসিহত বাণী

১. যদি খাঁটি মুসলমান হইতে চান! শরীয়তের ছোট বড় যাবতীয় হুকুম আহ্কাম মানিয়া চলুন। তাহলে মারেফতের এলেম সহজ হইয়া যাইবে। হামেশা (সর্বদা) ফয়েজ ও তাজাল্লী আপনার উপর ওয়ারেদ হইতে থাকিবে।

২. ছবর-ই (ধৈর্য্য) ধর্ম।

৩. অন্যের দোষ দেখার পূর্বে নিজের দোষ তালাশ করুন।

৪. প্রত্যেক নিঃশ্বাসে খেয়াল ক্বালবের ভিতর ডুবাইয়া রাখুন। নচেৎ হালাক বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয় আছে। জীবনভর এবাদত করিয়া শেষ নিঃশ্বাসে আল্লাহকে ভুলিয়া মরিলে, যাবতীয় এবাদত বরবাদ হইয়া যাইবে। জীবনের মেহনত ও ইবাদতের কোনই ফল ইহবে না। তাই আল্লাহর সকল প্রিয় বান্দাগণ শেষ নিঃশ্বাসে আল্লাহর নামের সাথে দম বাহির হইবার জন্য জীবনভর আল্লাহর হুজুরে কাঁদিতেন। আপনারা ঈমানের সহিত মরিবার জন্য কয়দিন কাঁদিয়াছেন? মাতালের মতো বেহুঁশ হইবেন না। হুঁশ করুন অমূল্য জীবন আর ফিরিয়া পাইবেন না।

৫. আত্মশুদ্ধি করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য আদর্শ ফরজ। আত্মশুদ্ধি না হইলে নিয়ত শুদ্ধ হইবে না। আর নিয়ত শুদ্ধ না ইহলে কোন এবাদত ই শুদ্ধ হইবে না।আত্ম জিন্দা ব্যতীত অধিকাংশ মানুষই মৃত্যুর সময় ঈমান নিয়া কবরে যাইতে পারিবে না।

৬. আমার এই তরীকার মূল শিক্ষা বা নীতি–
চুরি করিবে না, ডাকাতি করিবে না, মিথ্যা বলিবে না, না হক খুন করিবে না, বে আইনী কাজ করিবে না।

৭. ওরছ শরীফের মজলিশ-এ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত , জিকিরি আজকার ও ওয়াজ নসিহত করা হয়। জাম আম্বিয়া জামে আওলিয়া ও তামাম পৃথিবীর মোমেন মোমেনাতের আরওয়াহ পাকের উপর ছওয়াব রেছানী করা হয়। তাই আল্লাহ ও হযরত রাসূল পাক (স:) এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী জাকেরদের আদব ও মহব্বতের সহিত জবান বন্ধ করিয়া রাখিবার স্থান। হে জাকের ও আশেকগণ! মহান আল্লাহ তায়লার জিকিরে সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন।

৮. আল্লাহকে চিনিবার পথে অনেক দুঃখ-কষ্ট লোক-নিন্দা সহ্য করিতে হয়।

৯. ধীর স্থির ও অচঞ্চল ব্যক্তিই প্রকৃত মোমেন। যা মনে হয় তাহাই তিনি মনে করেন না এবং মুখে যা আসে তাহাই তিনি বলেন না।

১০. এক মুহূর্তকাল দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি সহস্র বছরের রোজা নামাজের চাইতে উত্তম।

১১. আল্লাহকে যিনি প্রকৃতভাবে চিনিয়াছেন, তিনিই তাহার সাথে ভালবাসা স্থাপন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি শুধুই দুনিয়াকে চিনিয়াছেন, সে আল্লাহ তালার সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছেন।

১২. পাঁচ ব্যক্তির সাথে সংস্রব রাখিও না (ক) মিথ্যুক- তাকে সঙ্গে রাখিলে ঠকবে, সে তোমার হিতকারী হতে পারে। সে জিন মূর্খ্যতার দরুন তোমার অমঙ্গল ঘটাবে। (খ) কৃপণ- সে সর্বদা নিজের লাভের জন্য তোমার ক্ষতি করিবে। (গ) নির্দয়- অভাবের সময় সে তোমাকে ধ্বংস করিবে। (ঘ) কাপুরষ- তোমার প্রয়োজনের সময়, সে তোমাকে ত্যাগ করিবে। (ঙ) ফাছেক- তার লোভ লালসা অত্যন্ত বেশী। নিজ স্বার্থের খাতিরে সে তোমাকে প্রাণে হত্যাও করিবে পারে।

১৩. যে ব্যক্তির অন্তরে যে পরিমাণ অহংকার প্রবেশ করিবে, সে পরিমাণ তার বুদ্ধি লোপ পাইবে।
১৪. নামাজ হল সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, ইবাদতে আকবর। তাই সকলেই আপনারা হুজুরী দিলে নামাজ পড়ার চেষ্টা তদবির করবেন।
১৫. শরিয়তের ছোট-বড় হুকুমকে মান্য করবেন, তবেই মারেফত সহজ হয়ে যাবে।
১৬. অন্যের দোষ দেখার পূর্বে নিজের দোষ দেখুন, তবেই কল্যাণ।
১৭. মা-বাবাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সেবা-যত্ন করবেন।
১৮. বড়কে শ্রদ্ধা-ভক্তি করবেন, ছোটকে স্নেহ-মোহব্বত করবেন।
১৯. ভুখা মানুষকে খানা খাওয়ালে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করলে, অসুস্থকে সেবা করলে, এসব সেবা আল্লাহতায়ালা নিজে গ্রহণ করেন।
২০. আগুন যেভাবে লাকড়ি বা কাঠকে খেয়ে ফেলে, হিংসা সেভাবে মানুষের নেক পুণ্য খেয়ে ফেলে।
২১. কতাবে আছে, চব্বিশ হাজার ছয়শত বার কোন জায়গায় আছে একুশ হাজার ছয়শত বার ২৪ ঘণ্টায় দম আসা-যাওয়া করে। শ্বাস টানতে 'আল্লাহ' ছাড়তে 'হু' এই অভ্যাস করবেন। তাই আল্লাহতায়ালা কোরআন মাজিদে আরো বলেন– 'আলা বি-জিকরুল্লাহি তাতমাইনূল কুলুব'। অর্থ: সাবধান! আল্লাহতায়ালার জিকিরেই অন্তরে শান্তি আসে।

সূফীবাদই শান্তির পথ

–খাজাবাবা কুতুববাগী